৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০০০

ত্রৈমাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৩য় বর্ষঃ	৭ম সংখ্যা
যিলহজ্জ	১৪২০ হিঃ
চৈত্র	১৪০৬ বাং
এপ্রিল	২০০০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ(বাসা)৭৬০৫২৫

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস- ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
আন্দোলন অফিস - ফোনঃ ৯৩৩৮৮৫৯।
যুবসংঘ অফিস - ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- ✪ **সম্পাদকীয়** ০২
- ✪ **প্রবন্ধঃ**
  - ❒ আশূরায়ে মহাররম করণীয় ও বর্জনীয় ০৩
    –সাঈদুর রহমান
  - ❒ মুসলিম ঐক্যের মানদণ্ড ০৫
    –অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ
  - ❒ সুদঃ অর্থনৈতিক কুফল ও উচ্ছেদের উপায় ০৭
    –শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
  - ❒ যঈফ ও জাল হাদীছ এবং মুসলিম সমাজে তার কুপ্রভাব ১৬
    –আখতারুল আমান
  - ❒ প্রচলিত সমাজ বনাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)–এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ১৮
    –কামরুয্যামান বিন আব্দুল বারী
- ✪ **ছাহাবা চরিতঃ**
  - ❒ খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) ২৩
    –মুহাম্মাদ বিলাল হুসাইন
- ✪ **চিকিৎসা জগৎ** ২৬
- ✪ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ**
  সুবিচার ২৭
- ✪ **কবিতা** ২৮
  ০ জিহাদের অনুমতি ০ অহি–র বিধান ০ সোনামণি ০ ইন্দ্রজাল উপাখ্যান ০ প্রয়োজন ০ মুক্তিকামী।
- ✪ **সোনামণিদের পাতা** ৩০
- ✪ **স্বদেশ–বিদেশ** ৩৩
- ✪ **মুসলিম জাহান** ৩৮
- ✪ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৩৯
- ✪ **তাবলীগী ইজতেমা ২০০০–য়ে প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহের সার সংক্ষেপ** ৪১
- ✪ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার মাসে অধীনতার কসরৎঃ

২৬শে মার্চ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। এ মাসেরই ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে রাজধানী ঢাকায় ঘুমন্ত মানুষের উপর হিংস্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নীতিহীন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। ফলে পরদিন ২৬শে মার্চকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। সাধারণ মানুষ সর্বদা স্বাধীনতা প্রিয় এবং এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখতে দেশের প্রতিটি নাগরিক সর্বদা আপোষহীন প্রতিজ্ঞায় অটল। কিন্তু সাধারণ জনগণের সরল প্রতিজ্ঞা ও দেশের নেতৃন্দের ইচ্ছা ও চেতনা কি একই মানদণ্ডে পরিমাপ করা যাবে? পাকিস্তানী শাসকদের অদূরদর্শিতার কারণে যেমন তখনকার স্বাধীনতা টেকেনি, তেমনি বাংলাদেশী নেতৃবৃন্দের অসচেতনতা ও অদূরদর্শিতার কারণে এ দেশের স্বাধীনতা যেকোন সময় উবে যেতে পারে, সেকথা সর্বদা সকলের মনে রাখা কর্তব্য। হাঙ্গরের প্রসারিত মুখ গহবরে সূঁচালো দন্তসারির মধ্যে একটি তরতাজা প্রাণ যেমন বেশীক্ষণ লাফ-ঝাঁপ করতে পারে না, বঙ্গীয় ব-দ্বীপ এই বাংলাদেশের স্বাধীনতাও অনুরূপ অনিশ্চয়তার চোরাবালিতে যেকোন সময় হারিয়ে যাওয়া মোটেই অচিন্তনীয় বিষয় নয়।

দেশটির ভূ-প্রকৃতি ও শস্য শ্যামল ভূ-অর্থনৈতিক অবস্থান চিরকাল বিদেশীদেরকে আকৃষ্ট করেছে। ফলে দেশটি অধিকাংশ সময় পরদেশী দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়েছে। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত দেশের এক দশমাংশ এলাকা নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক, ভূ-অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত অঞ্চল হিসাবে অবস্থিত। অঞ্চলটি বিশ্বের তিনটি খুবই গুরুত্ববহ ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক- দক্ষিণ-এশিয়া বা সার্ক অঞ্চল। দুই- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা আসিয়ান অঞ্চল। তিন- উত্তর-পূর্বের বিশাল চীন অঞ্চল। চীন ইতিমধ্যে পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ভারত নিকট ভবিষ্যতে পরাশক্তি হ'তে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার উর্ধে এরা কেউ নয়। বিশেষ করে ভারতের কোন প্রতিবেশী তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নয়। ফলে তাদের কারু সাথে তার সদ্ভাব নেই। চীন ও ভারতের মধ্যকার বৈরিতা সুপ্রকাশিত। অথচ উভয়েই চায় ভারত মহাসাগরে তাদের প্রভাব বলয় বিস্তার করতে। ভারত তো নেহরুর 'ইণ্ডিয়া ডকট্রিন' অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ তৈলক্ষেত্রসহ সুদূর মক্কা-মদীনা পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য সীমা বিস্তৃত করার স্বপ্ন দেখে। হাতে শক্তি পেলে সে যে তার স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করবে না, একথা হলফ করে বলার উপায় নেই।

ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র চট্টগ্রামকে এতদঞ্চলে অতীব প্রয়োজনীয় ভূ-কৌশলগত এলাকা হিসাবে বিবেচনা করে। কারণ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের 'সাতবোন রাজ্যমালা' (Seven Sisters States) তথা মণিপুর, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রভৃতি সাতটি রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী উলফা, বোড়ো, মিজো, নাগা, গুর্খা, কুকি ইত্যাদি মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপগুলি তাদের সশস্ত্র তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। তাদের ওপারেই রয়েছে বিশাল চীনের সশস্ত্র অবস্থান। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে তারা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় অর্ধাংশ দখল করে নেয় এবং তারা আজও বৃটিশদের দ্বারা চিহ্নিত ম্যাকমোহন লাইন (Mc Mohon Line)-কে স্বীকৃতি দেয়নি। তাই চীনকে ভারত সব সময় সন্দেহের নযরে দেখে। এই রাজ্যগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করার জন্য বাংলাদেশের বুক চিরে দ্রুত ও সরাসরি সমর সম্ভার প্রেরণের স্বার্থে ভারতের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সড়ক পথ খুবই যরূরী। অপরদিকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের এই ৫০/৬০ মাইল চওড়া এক ফালি ভূমি পেরুতে পারলেই চীন সরাসরি পৌঁছতে পারে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে- যা তাকে নিয়ে যাবে বঙ্গোপসাগর দিয়ে ভারত মহাসাগরের নীল পানিরাশিতে। যার মাধ্যমে সে নিয়ন্ত্রন করতে পারে ভারত মহাসাগরীয় বিশাল পানি সীমাকে। যেভাবে ভূমধ্যসাগরে নৌবহর পাঠিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের উপরে ছড়ি ঘুরাচ্ছে। একইভাবে তখন ভারত মহাসাগরে সামরিক নৌবহর পাঠিয়ে চীন সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একক পরাশক্তি হিসাবে ছড়ি ঘুরাতে সক্ষম হবে।

অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পরে একক বিশ্বশক্তি হিসাবে আমেরিকা এখন একবিংশ শতাব্দীতে চীনকেই তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মনে করছে। আর সেকারণেই সে চীনের বৈরীশক্তি হিসাবে ভারতকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চীনকে ভারত মহাসাগরের প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম থেকে দূরে রাখার জন্য বাংলাদেশের উপরে চাপ সৃষ্টি করে ভারতের সাথে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে। তাছাড়া ইতিমধ্যেই সেখানে এন,জি,ও তৎপরতার মাধ্যমে টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে চাকমা ও অন্যান্য উপজাতীয়দের খৃষ্টান বানানোর চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। যাতে অদূর ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সংখ্যাগরিষ্ট খৃষ্টান রাজ্য হিসাবে ঘোষণা ও স্বীকৃতি দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ইস্রাঈলের ন্যায় এবং ইন্দোনেশিয়ার বুকে পূর্ব তিমুরের ন্যায় এখানে একটি বিষফোঁড়া খৃষ্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। যার কাজ হবে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করা। সাথে সাথে চীন ও তার প্রতিবেশী তথা সমগ্র এশিয়ার উপরে আমেরিকা চোখ রাঙাতে সক্ষম হয়। সাথে সাথে সক্ষম হয় এতদঞ্চলের সম্পদরাজির অবাধ লুণ্ঠনের। মার্কিন কোম্পানী ইউনিকলের সাথে সম্প্রতি গ্যাস চুক্তি স্বাক্ষর ও চট্টগ্রামে বেসরকারীভাবে আমেরিকান পোর্ট নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

অন্যদিকে ভারতের সাথে পানি চুক্তি, ট্রানজিট চুক্তি, বাস চলাচল চুক্তি, অসম বাণিজ্য এবং অঘোষিত ভাবে সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপরে ভারতের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এখন ভারত, আমেরিকা ও চীনের ত্রিমুখী হামলার সম্মুখীন। অতএব মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি, স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী ইত্যাকার লকব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

ইতিমধ্যে নতুন এক খবর আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। গত ৮ই মার্চ সোমবার তথাকথিত বিশ্ব নারী দিবসে দিনাজপুরের হিলি চেকপোষ্টের নিকটে হাকিমপুর কলেজ ময়দানে বাংলাদেশের ২৫টি এনজিও এবং পশ্চিম বঙ্গের ২টি এনজিও নারী সংগঠনের ব্যানারে উভয় দেশের প্রায় দু'হাযার মহিলা মিছিল করে হিলি চেকপোষ্টে সমবেত হয় এবং এ সময় তারা নারী মুক্তির শ্লোগানের বদলে 'দু' বাংলা এক হও' শ্লোগান দেয়। বাংলাদেশের 'প্রশিকা' এনজিও-র কেন্দ্রীয় নারী-পুরুষ সমন্বয় কোষ-এর প্রধান ফৌযিয়া খন্দকার ইভার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত নারী সমাবেশে উভয় বাংলাকে এক করার দাবীতে বক্তৃতা করেন, পল্লীশ্রী-র শামীম আরা বেগম, মহিলা পরিষদের মনীরা খান, এডাব-এর কেন্দ্রীয় সদস্য শাহ-ই মুবীন জিন্নাহ, তৃণমূল নেত্রী মাকছূদা বেগম ও দিনাজপুর যেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা গুলনাহার মোহসিন। উক্ত সম্মেলনের পূর্বে কলিকাতা কেন্দ্রিক নারী মুক্তি সংগঠন 'স্বয়াস' ও 'মৈত্রী'র সভানেত্রী যথাক্রমে অনুরাধা কপূর ও অচিন্তা পাঠকের নেতৃত্বে সকালে ভারত সীমান্তের মধ্যে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর উভয় দেশের দু'হাযারের অধিক নারী উভয় দিক থেকে এসে চেকপোষ্টে সমবেত হয়ে ফুলের তোড়া বিনিময় করে। ... এ সময় হিলি চেকপোষ্ট উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং সকলে এসে হাকিমপুর কলেজ মাঠে সমাবেশে যোগদান করে। উক্ত নারী সম্মেলনকে সফল করার জন্য প্রশিকা, তৃণমূল ও এডাব ছাড়াও দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা ও জয়পুরহাট যেলার পঁচিশটির মত এনজিও থেকে পাঁচ হাযারেরও অধিক নারীর সমাবেশ ঘটে।

প্রশ্ন হ'লঃ প্রকাশ্য ভাবে সারাদিন স্বচ্ছন্দে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থল বন্দরে এতবড় একটা রাষ্ট্রঘাতি সম্মেলন হ'ল, তুখোড় বক্তৃতা হ'ল, 'দিলে দিলে দিল লাগি' হ'ল, তার কোন খবরই কি সরকার রাখেন না? স্বাধীনতা অতন্দ্র প্রহরী, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি, সরকারী গোয়েন্দা বাহিনী, নিদেনপক্ষে ঘাতক দালাল নির্মূল বাহিনীর সদস্যদের কারও নযরে পড়ল না? কি সরকারী দল কি বিরোধী দল এযাবত এর বিরুদ্ধে কোন বিবৃতি কিংবা তারা কোনরূপ ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানা যায়নি। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নে আমাদের নেতৃবৃন্দ কত বেহুঁশ তা এ থেকেই আঁচ করা যায়। সমাজকল্যাণের নামে এইসব এনজিওগুলো বছরের পর বছর ধরে এদেশে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, সরকার কি তা মোটেই বুঝতে পারেন না? গত ২০শে মার্চ থেকে সপ্তাহ ব্যাপী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সফর উপমহাদেশে একটি অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটিয়ে গেল। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে গেলেন যে, আমেরিকা এখন ভারতের সাথে। অতএব উপমহাদেশের যেসব দেশ ভারতের সাথে থাকবে, আমরা তাদের সাথে আছি। বাংলাদেশে তিনি এলেন মাত্র ১০ ঘন্টার জন্য স্রেফ সৌজন্য সফরে। আর পাকিস্তানে গেলেন ৫ ঘন্টার জন্য কেবল তাদেরকে শাসিয়ে দিতে যে, সাবধান! কাশ্মীর নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করো না। মানবাধিকারের স্বঘোষিত এই মোড়ল এজেন্ট কাশ্মীরে মানবাধিকার লংঘনকারী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেননি। গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী নামাংকিত আমেরিকার উদ্যোগেই ১৯৪৮-৪৯ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অথচ আজ সেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে খ্যাত ভারতের জন্য থেকে বিতর্কিত কাশ্মীর রাজ্যে গণভোট অনুষ্ঠানের কথা বলতে সাহস পেলেন না। অথচ পাকিস্তানী সামরিক নেতাকে সেদেশে তাড়াতাড়ি নির্বাচন দেওয়ার অঙ্গীকার আদায় করে ছাড়লেন। কাশ্মীরী মুক্তিযুদ্ধকে তিনি বলে গেলেন সন্ত্রাস। আফগান জনগণ দীর্ঘ ১০ বছর যাবত হানাদার রুশদের বিরুদ্ধে আমেরিকার সহায়তায় যখন যুদ্ধ চালিয়েছিল, তখন তারা ছিল আমেরিকার ভাষায় ফ্রীডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু সোভিয়েটের পতনের পর ঐ মুক্তিযোদ্ধারাই এখন আমেরিকার চোখে হয়ে গেছে মৌলবাদী সন্ত্রাসী। আমেরিকার এই দ্বৈত নীতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার থেকেই দেশের নেতৃবৃন্দকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি বহাল রাখার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে যোগ্য নেতৃবৃন্দ দান করুন- যারা দেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হবেন।- আমীন!! =(সঃ সঃ)

প্র ব ন্ধ

আশূরায়ে মুহাররমঃ করণীয় ও বর্জনীয়

*-সাঈদুর রহমান**

'আশূরা' আরবী শব্দ। যার অর্থ দশম। এখানে দশম দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল হিজরী সালের প্রথম মাস মুহাররমের দশ তারিখ। মহান রাব্বুল আলামীন ১২ মাসের মধ্যে মুহাররম, রজব, যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ এই চারটি মাসকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। এই মাসগুলিতে লড়াই-ঝগড়া, খুন-খারাবী ইত্যাদির অন্যায়-অপকর্ম হ'তে দূরে থেকে এর মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুমিন বান্দা ও বান্দীর ধর্মীয় কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, فَلاَ تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ 'এই মাসগুলিতে তোমরা পরস্পরের উপরে অত্যাচার কর না' (তওবা ৩৬)। ইসলামের ইতিহাসে মুহাররমের দশম দিন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররাম মাসের ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত।[১]

১০ই মুহাররম ইমাম হুসায়েন (রাঃ) কারবালা প্রান্তরে শাহাদত বরণ করেন। তাঁর শাহাদতের হৃদয় বিদারক ঘটনাকে স্মরণ করে এক শ্রেণীর অজ্ঞ লোক প্রতিবছর উক্ত দিনটি পালন করে থাকে। কিন্তু আমাদের সকলের জেনে রাখা উচিৎ যে, ফেরাঊনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর মুক্তি লাভের কারণে ১০ই মুহাররমের প্রতি ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম পালন করতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, এটি একটি মহান দিন। এইদিনে হযরত মূসা ও তাঁর জাতীকে আল্লাহপাক নাজাত দিয়েছিলেন ও ফেরাঊন ও তার দলকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। আল্লাহ্র শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এইদিন ছিয়াম পালন করেন। অতএব আমরাও এই দিনে ছিয়াম পালন করি। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'মূসার প্রতি তোমাদের চেয়ে আমাদের বেশী হক রয়েছে। অতঃপর তিনি ছিয়াম পালন করলেন ও সকল মুসলমানকে ছিয়াম পালন করার নির্দেশ দিলেন।[২]

করণীয়ঃ

নবী করীম (ছাঃ) ১০ই মুহাররমে ছিয়াম পালন করেছেন ও তাঁর উম্মতগণকে উহা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা আশূরার ছিয়াম পালন কর ও ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর। অর্থাৎ ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ই মুহাররম ছিয়াম পালন কর *(যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)*।[৩]

হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আল্লাহ্র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের ছগীরা গোনাহ-এর কাফ্ফারা হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে'।[৪]

উপরোল্লিখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে,

(ক) আশূরার ছিয়াম ফিরাঊনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার কারণে মূসা (আঃ) আল্লাহ্র শুকরিয়া হিসাবে পালন করেছিলেন।

(খ) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য নিয়মিত পালিত হ'ত।

(গ) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূল (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও তিনি পালন করতে চেয়েছিলেন। এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

(ঘ) মুহাররমের ছিয়াম মূসা, ঈসা ও উম্মতে মুহাম্মাদীতেও ছিল এবং আজও চালু আছে। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(ঙ) আশূরার ছিয়ামের সাথে হযরত হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কুফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালা নামক জায়গায় ৬১ হিজরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর প্রায় ৫০ বছর পরে হয়।[৫] মোটকথা মুহাররমে ২টি নফল ছিয়াম পালন ব্যতীত আর

---

*. *গ্রাজুয়েট, কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সউদী আরব ও উপাধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম অধ্যায়'।*

২. *মুসলিম হা/১১৩০।*

৩. *বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৮৭, মওকুফ ছহীহ; হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ।*

৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪।*

৫. *ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল ইস্তি'আব সহ (কায়রোঃ মাকতাবা ইবনে তাইমিয়াহ ১ম সংস্করণ ১৩৮৯/১৯৬৯) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৪৮, ২৫৩।*

কিছুই করার নেই। সাবধান! হুসায়েনের শাহাদতের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে নেকী পাওয়া যাবে না। কারণ, এই ছিয়াম হুসায়েনের জন্মের বহু পূর্ব হ'তে পালিত হয়ে আসছে।

বর্জনীয়ঃ

এক শ্রেণীর ভণ্ড লোকেরা ১০ই মুহাররম ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদতের স্মরণে শোক মিছিল বের করে, মর্সিয়া ও শোকগাঁথা গায়, 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' করে মাতম করে, ইমাম হুসায়নের (রাঃ) নকল কবর তৈরী করে, শরীরের অংশ বিশেষ কেটে নিজেকে রক্তাক্ত করে। ঐ ভূয়া কবরে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুঁকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়। মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়িয়ে কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তাঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়।

লাঠি-তীর-বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হুসায়েনের নামে কেক, পিঠা ও পাউরুটি বানিয়ে বরকতময় পিঠা বলে বেশী মূল্যে বিক্রি করা হয়। সুসজ্জিত অশ্বারোহীদল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। হুসায়েনের নামে পুকুরে মোরগ ছুড়ে যুবক যুবতীরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। কালো পোশাক পরিধান বা কালো ব্যাচ ধারণ করা হয়। এমনকি অনেকে এই মাসে বিবাহ শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐদিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুর দুধ পান করানোকেও অন্যায় ভাবেন। উগ্রপন্থী শী'আরা কোন কোন 'ইমাম বাড়া'তে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠি পেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সে কারণে আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। এছাড়া হযরত উমর, হযরত উছমান, হযরত মু'আবিয়া, হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল ক্বদর ছাহাবীগণকে বিভিন্নভাবে গালীগালাজ করে।

এ ছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা বুঝানোর চেষ্টা করে যে, ১০ই মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদতে হুসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে হক ও বাতিলের লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে মাছূম (নিষ্পাপ) ও ইয়াযীদকে 'মাল'উন' (অভিশপ্ত) প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

আশূরা উপলক্ষ্যে ঐসব বিদ'আতী ও শিরকী অনুষ্ঠানের কোন দলীল পাওয়া যায় না। এসব বানানো ও ভূয়া। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা হারাম। তাছাড়া ভূয়া কবর যিয়ারত করা মূর্তিপূজার শামিল। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ভূয়া কবর যিয়ারত করল, সে যেন মূর্তিকে পূজা করল'।[৬] অনুরূপভাবে শোক গাঁথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গায়ে আঘাত করে, কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[৭]

কারবালার ঘটনাকে স্মরণ করে অনেকে ইয়াযীদ, মু'আবিয়া আমর ইবনুল আছ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীকে গালি-গালাজ করে। এটি গোনাহের কাজ। ছাহাবীগণ সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানদের এই আক্বীদা পোষণ করা উচিৎ যে, তাদের কোন প্রকার সমালোচনা থেকে অন্তর ও জিহ্বাকে সংরক্ষণ করতে হবে, তাদের গালী-গালাজ করা যাবে না, বরং তাদের জন্য দো'আ করতে হবে, তাদের মধ্যে যেসব মতবিরোধ রয়েছে সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে তাদের যে মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে সেটি মেনে নিতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমার ছাহাবীদের গালী-গালাজ করোনা। আল্লাহ্‌র কসম তোমাদের কেউ ওহোদ পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করলেও তাদের একজনের এক মুষ্ঠির অর্ধেক পরিমাণ পৌঁছতে পারবেনা'।[৮]

শী'আদের ঐ সব শোকসভা বা শোকমিছিলে বাড়াবাড়ি করে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে হুসায়েনের কবরে রূহের আগমন কল্পনা করা, সেখানে সিজদা করা, মাথা ঝুঁকানো, প্রার্থনা করা ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে শিরক।

অতএব আমরা যেন আশূরার ছিয়াম পালন করে আল্লাহ নৈকট্য হাছিল করার চেষ্টা করি, ইমাম হুসায়েনের (রাঃ) শাহাদতের ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করি এবং আশূরাকে ঘিরে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ সমাজে চালু আছে তা থেকে নিজেকে ও অপরকে বিরত রাখতে তৎপর হই। সাথে সাথে নিজেদের ব্যক্তি জীবন ও বৈষয়িক জীবন এবং সর্বোপরি আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিখুঁত ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজাবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!!

---

৬. বায়হাক্বী, তাবারানী।
৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।
৮. বুখারী, ৪র্থ খণ্ড ১২০ পৃঃ, মুসলিম ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২২।

মুসলিম ঐক্যের মানদণ্ড

*-অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ**

মুসলিম জাতিসত্তা ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ঐক্য এবং একটি কেন্দ্রীয় শক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। ঐক্য ও সংহতি ছাড়া মূলতঃ একটি সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্বই বিপন্ন হ'তে বাধ্য। ইসলামী জীবন দর্শনে ঐক্যের উপর এত বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, জাগতিক বিষয়াদি ছাড়াও ইবাদত সম্পাদন ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন ছালাতের জন্য জামা'আতের বিধান দেয়া হয়েছে। একাকী ছালাত আদায় করার চাইতে জামা'আতে ছালাত আদায় করার ছওয়াব স্থানভেদে বহুগুণ অধিক বলে গণ্য করা হয়েছে। হজ্জ-এর ঐক্য তো আরো চমকপ্রদ। নিখিল বিশ্বের মুসলিম জনতা একই দিনে একই স্থানে একই সময়ে একই আমীরের অধীনে হজ্জ সম্পাদন করে থাকে। পৃথিবীর অন্য কোন জীবন দর্শন ঐক্যকে এত বেশী জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেনি। মুসলিম সেনাবাহিনীর রণাঙ্গনের সারিকে 'সীসা ঢালা প্রাচীর' (بنيان مرصوص)-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এহেন অবিচ্ছেদ্য ঐক্যই ইসলামী সমাজের কাম্য।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) গোটা মুসলিম জনতাকে একটি দেহ রূপে চিহ্নিত করে বলেছেনঃ

المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله –

'মুমিন জনতা একজন মানুষের মতই। তার চোখে ব্যাথা হ'লে সারা শরীর ব্যাথা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মাথায় যন্ত্রণা হ'লে সারা শরীর যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত-আলবানী হা/৪৯৫৪)*।

সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জনতা এক অখণ্ড জাতির অন্তর্ভুক্ত। তারা একই ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। এই ভ্রাতৃত্বে কোন আঁচড় নেই। কোন ফাঁকও নেই। বর্তমান বিশ্বে একশ' কোটিরও বেশী মুসলিম জনসমষ্টি এবং প্রায় অর্ধশ' মুসলিম দেশ থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক অনৈক্যের কারণে তারা নেতৃত্বের আসন থেকে বঞ্চিত। অথচ মুসলিম উম্মাহ ছিল একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতি। আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত তারা ঐক্যবদ্ধ থাকতে না পারার কারণে আজ তাদের এই দুর্গতি ও দৈন্যদশা। বিভেদ ও বিশৃংখলা, হিংসা ও বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি, বিবাদ ও বিসম্বাদ উৎখাত করে পবিত্র কুরআন মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে ঐক্য ও সংহতি, সততা ও সহানুভূতি, শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি এবং শান্তিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি। কিন্তু জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ ইত্যাদির নিশান উড়িয়ে এবং দেশপ্রেমের ধুঁয়া তুলে মুসলিম জনতাকে বিভক্ত করার অপচেষ্টা চলছে প্রতিনিয়ত। মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে তীব্রতর বিরোধের বীজ বপনের জন্য ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো এসব বিরোধকে তিল থেকে তাল করার কোন প্রচেষ্টাই বাদ রাখেনি। প্রচলিত চারটি মাযহাব, চারটি তরীকা, অসংখ্য পীরের বিভ্রান্তিকর প্রচারণা মুসলিম ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্ব এক অজেয় শক্তি। তাদের প্রকৃত দুশমন শয়তান ভাল করেই জানে যে, একমাত্র অনৈক্যের মাধ্যমেই তাদেরকে দুর্বল করা যেতে পারে। এ ছাড়া তাদেরকে দুর্বল করার অপর কোন পথ তেমন ফলপ্রসূ নয়। পবিত্র কুরআনে সারা বিশ্বের সকল মুসলিমকে 'এক উম্মাহ' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং যে কোন ধরনের বিভেদমূলক কাল্পনিক সুবিধাবাদী দাবীকে নাকচ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ

'এই যে তোমাদের জাতি- ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা কেবলমাত্র আমারই ইবাদত কর' (আম্বিয়া ৯২)।

মুসলিম জাতির অতীত শক্তিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁরা বিশ্বাস করতেন, মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব খতম করে দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই তাঁদের আগমন। নীতিগতভাবে আল্লাহ্‌কে প্রকৃত ইলাহ মেনে নেয়ার পরও কোন ব্যক্তি, বংশ বা গোষ্ঠির প্রাধান্য মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া শিরকেরই নামান্তর। আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার নির্ভুল পদ্ধতি শিখতে হ'লে কেবলমাত্র তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর দিকেই তাকাতে হবে। মহান আল্লাহ তাঁকে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে অহি-র মাধ্যমে পরিচালিত করেছেন। তিনি কিন্তু আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের অংশীদার নন। তিনিও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং তাঁর বান্দা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব সমাজের মধ্য থেকে তাঁকে বাছাই করে নবুঅতের মর্যাদা দিয়েছেন। সেকালের মুসলিম সমাজের প্রকৃত নেতাই ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তাঁর উপস্থাপিত ও পরিবেশিত শিক্ষা অনুসরণ করেই তারা তাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলেছিলেন।

ইসলামের সকল অনুশাসন পরিপূর্ণভাবে পালন করে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি এবং কল্যাণ আন্তরিকভাবে কামনা করতে হ'লে তাক্বলীদী বন্ধন ছিন্ন করে ও মাযহাবী

* মুহতামিম, মাদরাসাতুল হাদীছ, নাজিরা বাজার, ঢাকা ও নায়েবে আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

সংকীর্ণতা পরিহার করে সম্পূর্ণ খোলা মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে যেতে হবে। ফের্কাবন্দীর বেড়াজাল ছিন্ন করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অধিকার নিঃশর্তভাবে মেনে নিতে পারলেই ঐক্যবদ্ধ মহাজাতি গঠন সম্ভব হবে। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্র দ্বীনকে আল্লাহ্র যমীনে প্রতিষ্ঠা করার যে আন্দোলন তাকেই সত্যিকারের ইসলামী আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনের লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। এর ভিত্তি পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহ। কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই এই আন্দোলনের কার্যক্রম।

ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। ইসলামের অনুসারী মুসলিম জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী আদর্শবাদে সুদৃঢ় থাকতে পারলে তাদের অশান্তি ও দুর্গতির কোনই কারণ থাকতে পারে না। আমরা মুসলিম। আমাদের আল্লাহ এক, নবী এক, ধর্ম এক, কুরআন এক, ক্বিবলা এক এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক। তবু কেন আমরা আমল-আক্বীদায় এক থাকতে পারছিনা? কেন আমাদের মধ্যে এত অনৈক্য ও বিভেদ? মুসলিম সমাজে বহু মাযহাব, তরীকা, আদর্শ ও মতবাদ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যার ফলশ্রুতিতে মুসলিম জনতা আজ শতধা বিভক্ত। বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকাকে স্বীকার করে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্র জিগির অবাস্তব ও শূণ্য গর্ভ। মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ও সংহতি পুনরুদ্ধার করতে হ'লে সকল মাযহাব ও তরীকার মূলোৎপাটন করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত অপরিহার্য।

মুসলিম ঐক্যের মানদণ্ড আল্লাহ্র 'অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। ইসলাম কেবলমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছেই পাওয়া সম্ভব। অন্য কোথাও নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিমূলেই কেবলমাত্র শতধা বিভক্ত মুসলিম জনতার ঐক্য ও সংহতি বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে। ঐক্যের শ্লোগান সর্বত্রই শোনা যায়। কিন্তু 'বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য' বলে বাস্তবে কিছুই নেই। ঐক্যের কথা যারা বলেন তারা প্রত্যেকেই নিজেদের হক মনে করার কারণে ঐক্যের কোন গ্রহণযোগ্য পথনির্দেশ দিতে তারা অপারগ।

আমরা বিশ্বাস করি, কোন ব্যাপারে ঠিক একটিই হয়ে থাকে। একাধিক নয়। কুরআন-হাদীছের ফায়ছালাই কেবলমাত্র ঠিক। আর বাকী সব বেঠিক। ইসলাম আপোষহীন বৈপ্লবিক চেতনার নাম। ইসলাম কখনও আপোষকামী মনোভাব পোষণ করেনা। ইসলামের বক্তব্য সত্য-মিথ্যা কখনও এক হ'তে পারে না। ইসলামে আপোষ-রফার কোন বালাই নেই। আলো ও আঁধারকে, দৃষ্টিসম্পন্ন ও দৃষ্টিহীন অন্ধকে, ছায়া ও রৌদ্রকে এবং জীবিত ও মৃতকে যেমন এক ভাবা যায় না; তেমনি সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিল কোনক্রমেই এক হ'তে পারে না। ইসলাম সত্য, শ্বাশত, পূর্ণ পরিণত জীবন বিধান। তার সাথে কুফরীর মিতালী হ'তে পারে না। বাতিল মতবাদের সাথে মুসলিম জনগণের তাল মিলাবার কোনই সম্ভাবনা নেই। বাতিলের সাথে ইসলামের কোনরূপ আপোষ নেই। কোন কাফের ও কুফরী মতাদর্শের সাথে কোন মুসলিম কোন অবস্থাতেই আপোষ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবনের ঝুঁকি নিয়েও কুরাইশ কাফেরদের সকল আপোষ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ জান্নাতের পথ কখনও আপোষমূখী নয়। জান্নাতের অভিলাষী কোন মুমিন কোন অবস্থাতেই বাতিলের সাথে আপোষ করতে পারে না।

যাবতীয় কলহ-কোন্দলের প্রতিষেধক মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং তার ব্যাখ্যা ছহীহ হাদীছ। মুসলিম জীবনে চলার পথের অবলম্বন হিসাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হয়ে ব্যক্তিগত রায় ও ক্বিয়াসকে পরিত্যাগ করতে হবে। ইসলামের অনুসারী মুসলিম অন্য কোন ধর্ম ও আদর্শের সাথে কোনরূপ আপোষ করতে পারে না। ইসলাম আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত সকল ধর্ম ও মতাদর্শের উপর ইসলাম বিজয়ী। ইসলামের মধ্যে মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক যাবতীয় দিক ও বিভাগের পূর্ণ পথনির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে। অন্য ধর্ম ও তার অনুসারীদের সাথে ইসলামের অনুসারী মুসলিম জনতা কি আচরণ করবে তারও চমৎকার দিক নির্দেশনা ইসলামে দেয়া হয়েছে। মুসলিম হয়ে যদি কেউ তাতে পরিতৃপ্ত না হয়ে খৃষ্টান ও ব্রাহ্মন্যবাদীদের আবিষ্কৃত ও অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনুসারী হয়, তবে সে সন্দেহাতীতভাবেই ইসলাম বিরোধী জাহেলী মতাদর্শের অনুসারী।

ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোৎকৃষ্ট জীবন বিধান। তার অনুসারীরাও শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। সর্ব ধর্মের উপর ইসলামের স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যবোধ কোথায়? আর কোথায় মুসলিম জনতার ঐতিহ্য? ইসলামের অনুসারী হিসাবে পরিচয় দিয়েও আমাদের ঈমানের পূর্ণতা নেই। কথায় কাজে মিল নেই। হালাল-হারামের তমীয নেই। হক-না হকের বিচার নেই। ভাল-মন্দের যাচাই-বাছাই নেই। সমাজে সুবিচার নেই। পরিবারে শান্তি নেই। সাধারণ মানবতাবোধটুকুও নেই। শান্তি ও নিরাপত্তার মূর্ত প্রতীক ইসলামের অনুসারী মুসলিম সমাজ আজ অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। মুসলিম সমাজের সাম্প্রতিক এই করুণ পরিণতি কুরআন-হাদীছের শিক্ষা থেকে দূরে থাকারই ফলশ্রুতি। কুরআন-হাদীছের যুগোপযোগী সমাধান পেতে ব্যর্থ হয়ে আজ ক্রমেই মানুষ বস্তুবাদী দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা

ও গোড়ামী ছেড়ে সকল দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র চির শান্তির গ্যারান্টি কিতাব ও সুন্নাতের মর্মকেন্দ্রে সমবেত হওয়ার মাধ্যমেই সকল অনৈক্যের অবসান সম্ভব।

মুসলিম সমাজের করুণ দৃশ্য দেখে মনে হয় তারাই আজ নিকৃষ্ট ও অধঃপতিত জাতি। আল্লাহ্র তাওহীদ আজ ভুলুণ্ঠিত। সর্বত্র শিরকের ছড়াছড়ি। সুন্নাতের স্থান দখল করে নিয়েছে রকমারি বিদ'আত। শতধা বিভক্ত মুসলিম সমাজ ঐক্য ও সংহতি হারিয়ে ফেলেছে। রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বন্দ্ব ও ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে মুসলিম ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়ে গেছে। সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বলতে কিছুই নেই। স্নেহ ও শ্রদ্ধার পরিবর্তে পীড়ন ও হিংস্র অসদাচরণ, পিতা-পুত্রের মধ্যে বৈরীভাব। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন বহু ক্ষেত্রে দুর্বিসহ। জান-মালের কোন নিরাপত্তা নেই। ইয্যত-সম্মানের কোন বালাই নেই। খুন-খারাবীর যুলমাত সমাজ দেহকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা জাহেলীয়াতকে ছাড়িয়ে গেছে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও ধর্ষণ আজ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। দুর্নীতি দমনের কর্মচারীরা আজ দুর্নীতি পরায়নতায় লিপ্ত।

অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী জীবনদর্শনের গুরুত্ব অনুধাবন পূর্বক সার্বিক জীবনকে ইসলামের রঙ্গে রঞ্জিত করা অপরহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। ইসলামী আদর্শবাদের ভিত্তিতেই যতসব কুসংস্কারের সংস্কার সাধন, অপরাধমূলক ভ্রান্তিগুলোর সংশোধন এবং অনাচার ও অবিচারের অপনোদন সম্ভব হ'তে পারে। মহাসত্যের উৎস আল্লাহ্র 'অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কল্যাণজনক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সুন্দর, সুশৃংখল ও সুসঙ্গত সমাজ জীবন গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া একান্তভাবেই কাম্য। মহান আল্লাহ আমাদেরকে **ঐক্য ও সংহতির** খাতিরে, সংস্কার ও সংশোধনের লক্ষ্যে এবং পার্থিব ও পারলৌকিক সাফল্য লাভের স্বার্থে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণ করার স্বতঃস্ফূর্ত তাওফীক এনায়েত করুন। আমীন!!

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

সুদঃ অর্থনৈতিক কুফল ও উচ্ছেদের উপায়

*-শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

'...এবং আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল ও সুদকে করেছেন হারাম' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*।

আল্লাহ তা'আলা কালাম-ই-পাকে এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার মাধ্যমে সর্বকালের জন্যে, সকল বনু আদমের জন্যে একদিকে যেমন ব্যবসাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন অন্যদিকে সুদ ও সুদভিত্তিক সকল কার্যক্রমকে চিরতরে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। অর্থনীতিতে শোষণের অবসান ও যুলুমতন্ত্রের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যে মোক্ষম আঘাতটি ইসলাম হেনেছে তা হচ্ছে সুদের উচ্ছেদ। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ও অর্থনীতিতে যাবতীয় অসৎ কাজের মধ্যে সুদকে সবচেয়ে পাপের জিনিস বলে গণ্য করা হয়েছে। বস্তুতঃ সুদের মত সমাজ বিধ্বংসী অর্থনৈতিক হাতিয়ার আর দু'টি নেই। সুদের কুফলগুলির প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে কেন সুদ চিরতরে হারাম ঘোষিত হয়েছে।

সুদের অর্থনৈতিক কুফল

মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা হ'তে সুদের নানাবিধ কুফলের সন্ধান পাওয়া গেছে। সুদের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক এমনকি মনস্তাত্বিক কুফলও রয়েছে। কিন্তু সেসব আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধুমাত্র দৃশ্যমান ও বড় ধরনের অর্থনৈতিক কুফল সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'লো।

(১) সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম বা উপায়। একদল লোক বিনা শ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঋণ গ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হৌক বা না হৌক তাকে সুদের অর্থ দিতেই হবে। এর ফলে বহু সময়ে ঋণ গ্রহীতাকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হ'লেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। সুদ গ্রহীতারা হচ্ছে সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জন ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবন যাপন করে। উপরন্তু বিনা শ্রমে অর্থলাভের ফলে সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এদের কোন অবদান থাকে না।

(২) সুদের কারণেই সমাজে দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র এবং ধনী শ্রেণী আরো ধনী হয়। পরিণামে সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

বেড়েই চলে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষ প্রয়োজনের সময়ে সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে, উপায়ন্তর না দেখে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সেই ঋণ উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল উভয় প্রকার কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনুৎপাদনশীল কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহারের ফলে তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাই লোপ পায়। পুঁজিবাদী সমাজে 'করযে হাসানা'র কোন সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদনী খাতে ঋণ তো দূরের কথা, উৎপাদনী খাতেও বিনা সুদে ঋণ মেলে না। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো তাকে সুদ শোধ করতে হয়। এর ফলে সে তার শেষ সম্বল যা থাকে তাই বিক্রি করে উত্তমর্ণের ঋণ শুধরে থাকে। এই বাড়তি অর্থ পেয়ে আরো ধনী হয় উত্তমর্ণ। একই সংগে বৃদ্ধি পেতে থাকে সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য।

বাংলাদেশে ধনীরা যে ক্রমাগত ধনী হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার বিশেষ সহযোগিতা। যোগ্যতা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় জামানত দিতে না পারার কারণে সুদী ব্যাংকগুলো হ'তে ঋণ পায় না, অথচ বিত্তশালী ব্যবসায়ী বা শিল্প উদ্যোক্তারা সহজেই ঋণ পায়। ব্যাংক হাযার হাযার লোকের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু ঐ অর্থ ঋণ আকারে পায় মুষ্টিমেয় বিত্তশালীরাই। এ থেকে উপার্জিত বিপুল মুনাফা তাদের হাতেই রয়ে যায়। ফলে সঞ্চয়কারী হাযার হাযার লোক তাদের অর্থের প্রাপ্য আয় থেকে বঞ্চিত হয়। বিত্তশালী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা যে সুদ পরিশোধ করে তা জনগণের কাছ থেকে দ্রব্যমূল্যের সাথেই তুলে নেয়। ফলে তাদের গায়ে আঁচড় লাগে না, কিন্তু অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয় সাধারণ জনগণের। পরিণামে ধনীরা আরও ধনী হয়, গরীবরা হয় আরও গরীব। সমাজ হিতৈষীরা তাই যতই 'গরীবি হঠাও' বলে চিৎকার করুক না কেন, সমাজের মধ্যেই এই দৃঢ়মূল সুকৌশল ও সর্বব্যাপী শোষণ প্রক্রিয়া বহাল থাকা অবস্থায় দারিদ্র্য দূরীকরণের কোন প্রেসক্রিপশনই কার্যকর হবে না। একমাত্র সুদের মূলোৎপাটনের মাধ্যমেই 'গরীবি হঠাও' শ্লোগান সাফল্যের মুখ দেখতে পারে।

(৩) সুদ মানুষকে স্বার্থপর ও কৃপণ করে। অর্থলিপ্সা, কার্পণ্য ও স্বার্থপরতা সুদখোরদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিনা শ্রমে উপার্জনের আকাংখা ও অর্থলিপ্সা হ'তেই সুদ প্রথার জন্ম। সুদের মাধ্যমে নিশ্চিত ও নির্ধারিত আয়প্রাপ্তির লোভ সুদখোরদের বিচার-বিবেচনা, আবেগ-অনুভূতি এমনকি বিবেককে পর্যন্ত নিঃসাড় করে দেয়। সুদখোরদের মধ্যে লোভ ও কৃপণতা ক্রমে ক্রমে এতদূর প্রসার লাভ করে, তাদের আচার-আচরণের এতখানি পরিবর্তন ঘটে যে তারা হয়ে ওঠে সমাজের ঘৃণিত জীব। তাদের প্রবাদতুল্য কৃপণতা গল্প-কাহিনীরও খোরাক হয়ে ওঠে। ইংরেজী সাহিত্যের অবিসংবাদী সম্রাট সেক্সপীয়রের অমর সৃষ্টি শাইলকের (The Merchant of Venice) নাম কে না জানে? ইটালীয় সাহিত্যের মহাকবি দান্তে সুদখোরদের ঠাঁই দিয়েছেন নরকের অগ্নি বৃষ্টিময় সপ্তম বৃত্তে (Divina Comedia)। মধ্য যুগে ইউরোপে চার্চ সুদখোরদের আচরণ ও সীমাহীন লোভের জন্যে তাদেরকে দেহ পসারিণীদের সাথে তুলনা করেছিল।

(৪) সুদ শ্রমবিমুখতা ও অলসতা সৃষ্টি করে। সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলে কোন পরিশ্রম ও ঝুঁকি ছাড়াই সুদের মাধ্যমে নির্ধারিত হারে অর্থ পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থা যোগ্যতাসম্পন্ন, প্রতিভাবান ও কর্মী লোককেও অর্কমণ্য ও অলস বানিয়ে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা স্থাপন অর্থাৎ উৎপাদনধর্মী কাজে যে চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের দরকার সুদভিত্তিক সঞ্চয়কারীরা তা আর করে না। বরং ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ হ'তে বিনাশ্রমে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হারে আয় পেয়ে তারা পরিতৃপ্ত থাকে। ধীরে ধীরে আলস্য তাদের গ্রাস করে। এভাবে সুদের কারণেই যাদের হাতে অঢেল বিত্ত রয়েছে তাদের শ্রম, মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার ফসল হ'তে সমাজ বঞ্চিত হয়। সৃষ্ট হয় শ্রমবিমুখতা ও অলসতা। এ দেশের সাহিত্য হ'তেই এর ভুরি ভুরি নযীর মিলবে। বাংলাদেশে বিদ্যমান সুদী ব্যবস্থায় কেউ ব্যাংকে দশ লাখ টাকা জমা রেখে কোন রকম ঝুঁকি বা দুঃশ্চিন্তা ছাড়াই ঘরে বসে প্রতি মাসে ন্যূনতম এগারো হাযার টাকা পেতে পারে।

(৫) সুদ ভিত্তিক বিনিয়োগের ফলেই সামাজিক শোষণ সার্বিক ও সামষ্টিক, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক হওয়ার সুযোগ হয়েছে। সুদভিত্তিক ব্যাংক ও বীমা ব্যবসার কারণে ছোট ছোট সঞ্চয় সমাবেশ ও সঞ্চালনের সুযোগে বিরাট পুঁজি গড়ে উঠছে। বীমা ও ব্যাংক ব্যবসায়ে নিযুক্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এই পুঁজি চড়া সুদে ঋণ দিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করছে। একই সাথে ঋণ দেবার ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের বাছ-বিচারের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক শ্রেণীবৈষম্য। অর্থাৎ শ্রেণীবৈষম্য হ্রাস না পেয়ে আরও গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। উপরন্তু বাংলাদেশের সুদী ব্যাংকগুলো তাদের প্রদত্ত সুদকে ক্ষেত্র বিশেষে মুনাফার লেবাস পরিয়ে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টাও করছে। ফলে প্রতারিত হচ্ছে সরলপ্রাণ ধর্মভীরু মানুষ।

সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে শোষণ যে কত সার্বিক ও কৌশলপূর্ণ একটা উদাহরণের সাহায্যে তা তুলে ধরা হ'লো। ব্যাংকে আমানতকারীরা যে অর্থ সঞ্চিত রাখে তার পুরোটা ব্যাংক কখনই গচ্ছিত রাখে না। সাধারণতঃ ঐ অর্থের ৯০% ঋণ দিয়ে থাকে ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারী

উদ্যোক্তাদের। তারা এই অর্থের জন্যে ব্যাংককে যে সুদ দেয় তা আদায় করে নেয় জনগণের নিকট হ'তেই তাদের প্রদত্ত সেবা ও পণ্যসামগ্রীর মুল্যের সঙ্গেই। এদের মধ্যে ঐ সব আমানতকারীরাও রয়েছে যারা ব্যাংকে অর্থ রেখেছে সুদের মাধ্যমে নিশ্চিত নিরাপদ আয়ের উদ্দেশ্যে। আদায়কৃত সুদ হ'তে ব্যাংক একটা অংশ নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্যে রেখে বাকি অংশ আমানতকারীদের হিসাবে জমা করে দেয় তাদের প্রাপ্য সুদ বাবদ। এভাবেই ব্যাংক মাছের তেলে মাছ ভেজে নেয়। অন্যদিকে প্রতারিত হয় আমানতকারীরা। কিন্তু তারা কি কখনও তা তলিয়ে দেখার অবকাশ পায়? বরং বছর শেষে পাশ বই বা কম্পিউটারাইজড একাউন্ট শীটে যখন জমার বিপরীতে সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দেখে তখন তারা দৃশ্যতঃ পুলকিত বোধ করে।

উদাহরণ-১

সুদ বাবদ আমানতকারী (=ভোক্তা) ব্যবসায়ী/উৎপাদনকারীকে মূল্যের আকারে প্রদান করে	শতকরা টাকা ১৬/০০
-সুদ বাবদ আমানতকারী ব্যাংক হতে পায়	শতকরা টাকা ৮/০০
∴ ব্যাংকে জমার বিপরীতে আমানতকারীর নীট লোকসান দাঁড়ায়।	শতকরা টাকা ৮/০০

বিদ্যমান সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতি ও আইন এবং সমষ্টি অর্থনীতির (Macroeconamics) কর্মকৌশলের প্রেক্ষিতে কোনভাবেই এই অদৃশ্য অথচ প্রকৃতই লোকসান তথা শোষণ প্রতিরোধের উপায় নেই। এর প্রতিবিধান রয়েছে একমাত্র ইসলামী বিনিয়োগ ও ব্যাংকিং পদ্ধতির কর্মকৌশলের মধ্যে।

(৬) সুদের কারণেই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকেরা ফসল ফলাবার তাগিদেই নিজেরা খেতে না পেলেও ঋণ করে জমি চাষ করে থাকে। এই ঋণ শুধু যে গ্রামের মহাজনের কাছ থেকেই নেয় তা নয়। সরকারের কৃষি ব্যাংক থেকেও নেয়, নেয় অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকেও। যথোপযুক্ত বা আশানুরূপ ফসল হওয়া সব সময়েই অনিশ্চিত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্বিপাক তো রয়েছেই। *যদি ফসল আশানুরূপ না হয় বা প্রাকৃতিক* দুর্বিপাকের ফলে ফসল খুবই কম হয় বা মোটেই না হয় তবু কিন্তু কৃষককে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদসহ ঋণ শোধ করতে হয়। তখন হয় তাকে আবার নতুন ঋণের সন্ধানে বের হ'তে হয় অথবা জমি-জিরাত বেচে কিংবা বন্ধক রেখে সুদ-আসলসহ শুধতে হয়। তা না হ'লে কি মহাজন, কি ব্যাংক সকলেই আদালতে নালিশ ঠুকে তার সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করিয়ে নেবে। নীলামে চড়াবে দেনার দায়ে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

ধরা যাক, কৃষি ব্যাংক হ'তে আলু চাষের জন্যে কোন কৃষক ১৬% সুদে ২০০০/-টাকা ঋণ নিলো। তাকে অবশ্যই এজন্যে বছর শেষে বাড়তি ৩২০/- টাকা পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ ঐ কৃষকের জমিতে আরও বেশী আলু উৎপন্ন হ'তে হবে। গড়ে আশি টাকা মণ হ'লে বাড়তি চার মণ আলু উৎপাদন হওয়া চাই। মজা হলো, আলুর ফলন বেশী হ'লে তা সবারই ক্ষেতে হবে। ফলে দাম পড়ে যাবে। আলুর দাম যদি মণপ্রতি টাঃ ৮০/- হ'তে টাকা ৭০/-তে নেমে আসে তাহ'লে চাষীর মণপ্রতি টাকা ১০/- অর্থাৎ মোট টাকা ৪০/-ঘাটতি থেকে যাবে। ঋণের পরিমাণ যত বেশী হবে ঘাটতির পরিমাণও তত বেশী হবে। বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র কি? ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের ২৭% ভূমিহীন ছিল। কিন্তু মাত্র ৩৭ বছরের মধ্যে এই চিত্র পাল্টে গেছে। ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি শুমারী হ'তে দেখা যায়, বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সংখ্যা মোট কৃষিনির্ভর পরিবারের ৬৮.৮% এ দাঁড়িয়েছে (সূত্রঃ স্ট্যাটিস্টিকাল পকেট বুক অব বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃঃ ১৭৯)।

প্রসংগতঃ মনে রাখতে হবে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর হ'তেই এদেশে কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কৃষকদের অব্যাহতভাবে ঋণ দেওয়া শুরু করে। রাষ্ট্রপতি যিয়াউর রহমানের আমলে তাঁর নির্দেশে দেওয়া একশ কোটি টাকার আই.আই.সি.পি. ঋণের প্রায় সবটাই আজও অনাদায়ী রয়ে গেছে। এরপরও বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর নির্বাচনী ওয়াদা মুতাবিক পাঁচ হাযার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজীবর রহমানের আমলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা প্রদান রহিত করা হয়। এরপরেও কেন দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে? কারণ একটাই, সুদভিত্তিক ঋণ প্রদান বা গ্রহণ। শুধু এদেশেই নয়, যে সমস্ত দেশে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক কৌশলগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি অথবা মূল্য সহায়তা (price support) বা উৎপাদন ভর্তুকী (input subsidy) আকারে বিশেষ সরকারী সহায়তা দেওয়া হয়নি সেসব দেশে সুদনির্ভর লেনদেনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা ক্রমেই ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছে।

(৭) সুদের পরোক্ষ ফল হিসাবে একচেটিয়া কারবারের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে শর্তে ও যে সময়ের জন্যে ঋণ পেতে পারে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হ'তে, ছোট ব্যবসায়ীরা সেভাবে ঋণ পায় না। এজন্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও তারতম্য ঘটে। সে প্রতিযোগিতায় অসম সুবিধা ভোগের সুযোগ নিয়ে বড় কারবারী বা ব্যবসায়ী আরো বড় হয়। আর ছোট কারবারী বা ব্যবসায়ী টিকতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যায়। বৃহদায়তন

শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাই। এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুধু ব্যাংকই নয়, পুঁজিপতি ও অনৈসলামী সরকারসমূহ যে বিশেষ সুবিধা ও ন্যূনতম সুদের হারে টাকা ঋণ দিয়ে থাকে, ছোট বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্যে আদৌ সে সুযোগ নেই। ফলে বড় শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতাহীন বাজারে একচেটিয়া কারবারের সমস্ত সুযোগ লাভ করে। পরিণামে সামাজিক বৈষম্য আরো প্রকট হয়।

(৮) সুদের ফলেই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে পুঁজি সীমাবদ্ধ থাকার সুযোগ পায়। তাদের হাতেই পুঁজি আবর্তিত ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা সুদের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, হাত গুটিয়ে বসে থাকা একটি শ্রেণী বিনাশ্রমে এর সাহায্যে উপার্জন করতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে, অবৈধভাবে বা অন্য কোন উপায়ে কেউ প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে পারলে সুদের বদৌলতেই সে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যেতে পারে। এজন্যে এদের মধ্যে অকর্মণ্যতা, বিলাসিতা ও দুষ্কর্মের প্রসার ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই তখন সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হয়।

(৯) সুদের জন্যে দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের উপর পরিবহন খরচ, শুল্ক (যদি থাকে), অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে পণ্যসামগ্রীর বিক্রি মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের উপর উপর্যুপরি সুদ যোগ করে দেওয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চার বার পর্যন্ত, ক্ষেত্র বিশেষে তারও বেশীবার সুদ যুক্ত হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের বস্ত্র শিল্পের কথাই ধরা যেতে পারে। এই শিল্পের প্রয়োজনে আমদানীকারকরা ব্যাংক হ'তে যে ঋণ নেয় বিদেশ থেকে তূলা আমদানীর জন্যে তার সুদ যুক্ত হয় ঐ তূলার বিক্রি মূল্যের উপর। এরপর সূতা তৈরীর কারখানা ব্যাংক হ'তে যে ঋণ নেয় তারও সুদ যুক্ত হয় ঐ তূলা থেকে তৈরী সূতার উপর। পুনরায় ঐ সুতা হ'তে কাপড় তৈরীর সময়ে বস্ত্রকল সংস্থা বা কোম্পানী যে ঋণ নেয় সেই সুদ যুক্ত হয় কাপড়ের উপর। এরপর কাপড়ের এজেন্ট বা ডিলার তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যাংক হ'তে যে ঋণ নেয় তারও সুদ যোগ করে দেয় ঐ কাপড়ের কারখানা মূল্যের উপর। এভাবে চারটি স্তর বা পর্যায়ে সুদের অর্থ যুক্ত হয়ে বাজারে কাপড় যখন খুচরা দোকানে আসে বা প্রকৃত ভোক্তা ক্রয় করে তখন সে আসল মূল্যের চেয়ে বহুগুণ বেশী দাম দিয়ে থাকে।

একটা নমুনা হিসাবের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হ'লো। ধরা যাক, বিদেশ হ'তে তূলা আমদানীর জন্যে কোন ব্যবসায়ী ব্যাংক হ'তে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিলো। এরপর বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে তা থেকে তৈরী কাপড় বাজারে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত সুদজনিত মূল্যবৃদ্ধির চিত্রটি কেমন দাঁড়াবে? দু'টো অনুমিতি (Assumption) এখানে ধরা হয়েছেঃ (ক) উৎপাদন, বিপণন, গুদামজাতকরণ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাংক হ'তে ঋণ নেওয়া হয়েছে, এবং (খ) সুদের হার সকল ক্ষেত্রেই ১৬%। এই উদাহরণে বিভিন্ন পর্যায়ের অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় (যেমন- জাহাজ ভাড়া, কুলী খরচ, বিদ্যুৎ/জ্বালানী ব্যয়, গুদাম ভাড়া, পরিবহণ ব্যয়, শ্রমিকের বেতন/মজুরী, সরকারী কর/শুল্ক ইত্যাদি) ধরা হয়নি।

উদাহরণ-২

ক. আমদানীকারীর বিদেশী তূলার ক্রয়মূল্য টাঃ ১,০০,০০০/০০ হ'লে তূলার বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাঃ ১,১৬,০০০/০০।

খ. সূতা তৈরীর মিলের তূলার ক্রয়মূল্য টাঃ ১,১৬,০০০/০০ হ'লে সূতার বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাঃ ১,৩৪,৫৬০/০০।

গ. কাপড় তৈরীর মিলের সূতার ক্রয়মূল্য টাঃ ১,৩৪,৫৬০/০০ হ'লে কাপড়ের বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাঃ ১,৫৬,০৮৯/০০।

ঘ. মিল হ'তে এজেন্ট/ডিলারের কাপড়ের ক্রয়মূল্য টাঃ ১,৫৬,০৮৯/০০ হ'লে বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাঃ ১,৮১,০৬৪/০০।

ঙ. এজেন্টের কাছ থেকে পাইকারী বিক্রেতার কাপড়ের ক্রয়মূল্য টাঃ ১,৮১,০৬৪/০০ হ'লে বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাঃ ২,১০,০৩৪/০০।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, যে তূলার মূল ক্রয়মূল্য ছিল টাঃ ১,০০,০০০/০০ সেই তূলা হ'তে তৈরী কাপড় ভোক্তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছাতে সুদ বাবদেই মূল্যের সাথে অতিরিক্ত টাঃ ১,১০,০৩৪/০০ যুক্ত হয়েছে, যা ভোক্তাকেই দিতে হবে। কারণ চূড়ান্ত বিচারে শেষ অবধি প্রকৃত ভোক্তাই মোট সুদের ভার বহন করে। এর অন্তর্নিহিত অর্থই হচ্ছে সুদ দিতে না হ'লে অর্থাৎ সুদ উচ্ছেদ হ'লে এই অতিরিক্ত বিপুল অর্থ (টাকাপিছু ১.১০ টাকা) ভোক্তাকে দিতে হ'তো না। সেক্ষেত্রে বিদ্যমান আয়েই কাপড়ের ক্রয় ক্ষমতা ভোক্তার নাগালের মধ্যে থাকতো।

এভাবে সামজে দৈনন্দিন জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রত্যেকটিতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুদ জড়িয়ে আছে। নিরুপায় ভোক্তাকে বাধ্য হয়েই সুদের জন্যে সৃষ্ট এই চড়া মূল্য দিতে হয়। কারণ সুদনির্ভর অর্থনীতিতে এছাড়া তার গত্যন্তর নেই। অথচ সুদ না থাকলে অর্থাৎ, সুদবিহীন অর্থনীতি চালু থাকলে এই যুলুম হ'তে জনসাধারণ রেহাই পেত। এতে শুধু তাদের জীবন যাত্রার ব্যয়ই কম হ'তো না, জীবন যাপনের মান হ'তো আরো উন্নত।

(১০) সুদ মজুরী বৃদ্ধির অন্যতম বড় প্রতিবন্ধক। কারণ সুদের হার উচ্চ থাকলে বিনিয়োগ থাকে ন্যূনতম কোঠায়।

তখন মুনাফা অর্জনই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় শিল্প উদ্যোক্তার পক্ষে। সে সময়ে মজুরী বৃদ্ধি মানেই লোকসানের ঝুঁকি নেওয়া। সুদের হার কম থাকলে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বেশী হ'তে পারে কিন্তু পুঁজির সরবরাহ বৃদ্ধি পায় না। সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ কম হওয়ার ফলে শ্রমিকের চাহিদাও কম থাকে। অন্যদিকে চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান অনেক বেশী থাকার ফলে তাদের দিক থেকে মজুরী বৃদ্ধির দাবী উত্থাপন আদৌ সহজ হয় না। উপরন্তু কম মজুরীতেই চাহিদার চেয়ে শ্রম সরবরাহ বেশী হওয়ায় উদ্যোক্তারা মজুরী বৃদ্ধির দাবী মেনে নিতে চায় না। ফলে অনিবার্যভাবেই সংঘাত দেখা দেয়। কর্মবিরতি, ঘেরাও, ধীরে চলো, ধর্মঘট, হরতাল, অবস্থান ধর্মঘট এরই বাস্তব রূপ। পরিণামে মালিক পক্ষ ছাঁটাই, লক আউট ইত্যাদি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে সুদের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে বিক্রীও হ্রাস পায়। এই অবস্থায় মজুরী বৃদ্ধি পেলে মুনাফার হার হ্রাস পেয়ে সুদের হারের চেয়েও নীচে নেমে যেতে পারে। তাই মজুরী বৃদ্ধির কোন দাবীই শিল্প মালিকদের পক্ষে বিবেচনায় আনা সম্ভব হয় না।

এই কারণেই জাপানে মেইজী শাসন আমলে মজুরী বৃদ্ধির জন্যে শ্রমিকদের জোর দাবী থাকলেও যাইবাৎসু গোষ্ঠী তা মেনে নেয়নি, সরকারও এ ব্যাপারে শ্রমিকদের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। বৃটেনেও কৃষকদের স্বার্থে প্রণীত ১৮১৫ সালের শস্য আইন (Corn Law) মাত্র ত্রিশ বছর পরেই বাতিল করা হয় শিল্পপতিদের স্বার্থে। শিল্প বিপ্লবের সেই স্বর্ণযুগে শিল্প শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী না মানার ও শিল্পপতিদের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে কৃষকদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এই পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

(১১) সুদ দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে থাকে। সুদনির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো দীর্ঘ সময় ধরে পুঁজি আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এমন ধরনের বিনিয়োগে আদৌ উৎসাহ দেখায় না। এ জন্যেই দেশে ব্যয়বহুল বড় শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে পারে না। এসব শিল্প-কারখানা স্থাপনে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় তা সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিলে প্রতি বছর বিপুল অংকের অর্থ সুদ হিসাবে পরিশোধ করতে হবে। বড় বড় কারখানা সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে চালু হ'তে দুই হ'তে তিন বছরের gestation period প্রয়োজন হয়। এই দীর্ঘ সময়ে সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে এমন অংক দাঁড়াবে যে সে বোঝা বহন করা লাভজনক শিল্পের পক্ষেও সম্ভব নয়। আর লোকসান হ'লে সুদে-আসলে ঋণের যে অংক দাঁড়ায় তা পরিশোধ করা কখনো সম্ভব হয় না। স্বাভাবিকভাবেই উদ্যোক্তা তখন দেউলিয়া হ'তে বাধ্য হয়।

(১২) সুদ সঞ্চয়কে অনুৎপাদনশীল বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। সুদী অর্থনীতির ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকাররা ঝুঁকিমুক্ত, নিশ্চিত ও নির্ধারিত আয় পাওয়ার উদ্দেশ্যে জনগণের গচ্ছিত আমানতের বিরাট এক অংশ ট্রেজারী বিল ক্রয়, বিনিময় বিল ভাঙানো, সরকারী সিকিউরিটি বা ঋণপত্র ক্রয় ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। ফলে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগের জন্যে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব দেখা দেয়। পরিণামে সুদের হার বৃদ্ধি পায় এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা আরো হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়। কর্মসংস্থানের সংকোচন ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটে। অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয় সংকটের। এই অবস্থায় প্রায়শঃই সরকারকে এগিয়ে আসতে হয় সংকট মোচনের জন্যে।

(১৩) সুদ বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ায়। উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রায়শঃ শিল্প ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণের জন্যে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ঐ সব ঋণ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে সুদসহ পরিশোধযোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রায়ই দেখা যায় ঐসব ঋণ না নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়া যায়, না উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগিয়ে কাংখিত উন্নতি অর্জন করা যায়। ফলে ঋণ পরিশোধ তো দূরের কথা, অনেক সময়ে শুধু সুদ শোধ দেওয়াই দায় হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় পূর্বের ঋণ পরিশোধের জন্যে এইসব দেশ আবার নতুন করে ঋণ গ্রহণ করে। এই নতুন ঋণ সুদে-আসলে পূর্বের ঋণকে ছাড়িয়ে যায়।

অনুরূপভাবে দেশে কোন বিপর্যয় বা সংকট দেখা দিলে অথবা খাদ্য শস্যের মতো অপরিহার্য পণ্যের ঘাটতি ঘটলে তা পূরণের জন্যে সরকারকে বন্ধু দেশ বা ঋণদানকারী কনসর্টিয়াম থেকে ঋণ নিতে হয়। ভোগের জন্যে গৃহীত এই ঋণের বিপরীতে যেহেতু কোন উৎপাদন বা কর্মসংস্থান হয় না, সেহেতু এই ঋণের আসল পরিশোধ তো দূরের কথা সুদই পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। সুদ-আসলে সমুদয় ঋণই বোঝা হয়ে চাপে জনগণের কাঁধে। এক্ষেত্রে হয় বাড়তি কর আরোপ করে এই অর্থ জনগণের কাছ থেকেই আদায় করতে হয়, নয়ত আবারও ঋণ নিতে হয়।

(১৪) সুদের বিদ্যমানতার ফলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, সুদের কারণেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় অবশ্যম্ভাবী ভাবে ও অপ্রতিহত গতিতে। উপরন্তু অব্যাহত মুদ্রাস্ফীতি ঘটার অন্যতম কারণও সুদ। এই দু'য়ের যোগফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে। নির্দিষ্ট আয়ের শ্রমজীবী, সাধারণ কৃষিজীবী, নানা ধরনের পেশাজীবী ও বেতনভুক কর্মচারীরা

এই সাধারণ মানুষের কাতারে শামিল। এদের আয়ের স্তর ও পরিমাণ যেহেতু মোটামুটি একটা দীর্ঘ সময় ধরে একই রকম থাকে সেহেতু দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির ফলে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন জীবন যাপনের মানের অবনতি ঘটে অন্যদিকে বাজারেও কার্যকর চাহিদার সংকোচন ঘটে। এরই চূড়ান্ত পরিণাম হিসাবে কল-কারখানায় মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায়, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনাও রুদ্ধ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ ঠিক রাখার জন্যে এক্ষেত্রে পুনরায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় শিল্প-উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা। জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা তখন কমে যায় আরও এক ধাপ।

(১৫) সুদ ভিত্তিক ঋণে তৈরী প্রতিষ্ঠান কোন ক্ষতির সম্মুখীন হ'লে উদ্যোক্তা সম্পূর্ণ পর্যদুস্ত হয়ে পড়ে। উদ্যোক্তা যতক্ষণ ব্যাংকের সুদ পরিশোধ করে ততক্ষণ ব্যাংক তার ঋণ মঞ্জুরী অব্যাহত রাখে। এমনকি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিও করে। কিন্তু যখনই কারবারে লোকসান দেখা দেয় তখন ব্যাংক নতুন অর্থ লগ্নি করা তো দূরে থাক পূর্বের ঋণ ফেরত দেবার জন্যেই চাপ দেয়। এই অবস্থায় উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী মাথায় হাত দেয়। কারণ তার নিজের পুঁজি ছিল সামান্যই, পুরো ব্যাপারটাই ছিল পরের ধনে পোদ্দারী। ফলে এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। পরিণামে গোটা কারবারটি বন্ধ বা ধ্বংস হয়ে যায়।

(১৬) সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের কারণে ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্বের বোঝা চাপে সমগ্র জাতির ঘাড়ে। বাংলাদেশ এর উজ্জ্বলতম উদাহরণ। ধনী ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিরা নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদানের অঙ্গীকারে ব্যাংক হ'তে তাদের দেওয়া Collateral বা জামানতের বিপরীতে দশগুণ বা তারও বেশী পরিমাণ ঋণ পেয়ে থাকে। অর্থাৎ নিজেদের দশ লক্ষ টাকা থাকলে তারা এককোটি টাকা ঋণ পায়। এক্ষেত্রে অনেক সময়ই রাজনৈতিক প্রভাব বা সম্পৃক্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোটি টাকারও বেশী এই অর্থের ব্যবসা বা শিল্পে যে মুনাফা হয় তার সবটুকুই ভোগ করে ঐ ঋণগ্রহণকারী উদ্যোক্তা। ব্যাংকে যারা অর্থ আমানত রাখে তারা সেবা বা দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বাবদ প্রদত্ত সুদের অংশবিশেষ ফেরৎ পেলেও মুনাফার কোন অংশই তারা পায় না। অথচ ঐ ব্যবসা ও শিল্পে তাদের অর্থও ব্যবহৃত হয়েছিল। অপরদিকে ব্যবসায় বা শিল্প লোকসানের কারণে দেউলিয়া হ'লে তার দায়ভার চাপে গোটা জাতির উপর। জনগণের সঞ্চয় আর ফেরত পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার দৃশ্যমান লোকসান ঐ দশ লাখ টাকা হ'লেও (যদিও পূর্বের মুনাফা সে পুরোটা একাই ভোগ করেছে) জনসাধারণের লোকসান পুরো কোটি টাকাই। কষ্ট করে এই টাকা যারা সঞ্চয় করে ব্যাংকে আমানত রেখেছিল তাদেরই এখন ফতুর হবার পালা।

বাংলাদেশের ঋণ খেলাপী শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রী করে দিলেও ব্যাংক হ'তে তাদের গৃহীত ঋণ শোধ হবার নয়। কারণ এর পিছনে অদৃশ্য হাতের কারসাজি কাজ করেছিল। রাজনৈতিক মদদে ঋণ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টসের সদস্যরাই নামে বেনামে ঋণ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশের কোন তোয়াক্কা না করে। অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ প্রকল্প সমীক্ষাও করা হয় না। শুধুমাত্র সুদের হিসাব কষেই কল্পিত মুনাফার লোভনীয় টোপ দিয়ে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে হাযার হাযার কোটি টাকা, যা আর কোন দিনই ব্যাংকে ফিরে আসবে না। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলো সরকারী তহবিলের মদদ পেলেও বেসরকারী ব্যাংকগুলো এই দায় উদ্ধারের জন্যে কার মদদ পাবে?

(১৭) সুদ অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতার অন্যতম মূখ্য কারণ। একথা সর্বজনবিদিত যে, পুঁজি বাজারে মূলধনের চাহিদা হ্রাস পেলে সুদের হার হ্রাস পায়, আবার মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সুদের হারও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের সুদের হারের ওঠা-নামা কালীন সারির তথ্য (Time series data) বিশ্লেষণ করে কোন দেশে সুদের হার দীর্ঘকাল স্থিতিশীল থাকতে পারে না। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোন কারণে তেজীভাব শুরু হ'লে মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পুঁজির যোগানদার তখন সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে পুঁজির চাহিদা হ্রাস পেতে শুরু করে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তা পূর্বের চেয়েও হ্রাস পায়। এর মুকাবিলায় সুদের হার আবারও হ্রাস করা হয়। পুনরায় মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সুদের হার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এভাবে সুদের হারের ঘন ঘন ওঠা-নামার কারণে বিনিয়োগকারীরা নিক্ষিপ্ত হয় অনিশ্চয়তার মধ্যে। এরই ফলে বিনিয়োগ, শেয়ার, পণ্য ও মুদ্রা বাজারে দারুণ অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হয় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রীডম্যান বলেছেন, সুদের হারের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত ওঠা-নামার ফলে যেকোন দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক অস্থিরতার সৃষ্টি হ'তে পারে।

(১৮) সুদের কারণে অর্থনীতির কল্যাণকর খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ হ্রাস পেতে বাধ্য। পরিণামে সামাজিকভাবে কাম্য সেবা ও দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহে সংকোচন ঘটে অনিবার্যভাবেই। সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, তা উৎপাদনমুখীই হৌক আর সেবামুলকই হোক, একই হারে মুনাফা হয় না। কোন ক্ষেত্রে মুনাফার হার

সুদের হারের চেয়ে বেশী, কোথাও সমান, আবার কোথাও বা কম। সাধারণভাবে বিলাস সামগ্রী ও সমাজের জন্যে অকল্যাণকর খাতে উৎপাদন ও ব্যবসায়ে মুনাফার হার হয়ে থাকে সর্বোচ্চ। প্রসাধন ও বিলাস সামগ্রী, সৌখিন দ্রব্য, মদ ও নেশার বস্তু ইত্যাদি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পক্ষান্তরে সমাজের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় ও কল্যাণকর দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার ক্ষেত্রে মুনাফার হার প্রায়শঃই খুব কম থাকে। এমনকি তা প্রদেয় সুদের হারের চেয়েও কম হ'তে পারে। ফলে সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে যেখানে মুনাফার হার সুদের হারের চেয়ে বেশী সেখানেই বিনিয়োগ হয় সর্বাধিক। অপরদিকে যেসব অত্যাবশ্যকীয় খাতে মুনাফার হার সুদের হারের সমান বা কম সেখানে কোন বিনিয়োগকারী এগিয়ে আসতে আগ্রহী হয় না। কারণ সুদ প্রদানের পর তার আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। অথচ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এই খাতে বিনিয়োগ সবচেয়ে যরূরী। যদি অর্থনীতিতে সুদ না থাকতো তাহ'লে বিনিয়োগকারীরা (এবং মূলধনের যোগানদারেরাও) প্রাপ্তব্য মুনাফাতেই (তার হার যত কমই হোক না কেন) পুঁজি বিনিয়োগে দ্বিধা করতো না। ফলে সমাজের অপরিহার্য ও কল্যাণকর খাতের সম্প্রসারণ ও কর্মদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হ'তো।

(১৯) সুদের কারণেই অর্থনীতিতে ব্যবসায় চক্রের (Business Cycle) সৃষ্টি হয়। অর্থনীতিতে বারবার মন্দা ও তেজীভাবের আবর্তন হ'তে থাকে। যার ফলে সব সময় অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। যেকোন অর্থনীতির জন্যে এ অবস্থা অনাকাংখিত। অর্থনীতিতে যখন তেজীভাব থাকে তখন সুদের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে সুদের হার যখন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তখন ঋণ গ্রহীতারা হিসাব করে যদি দেখে যে, অতিরিক্ত সুদের হারের কারণে লাভের সম্ভাবনা খুব কম তখন তারা ঋণ নেওয়া বন্ধ করে দেয়। এর ফলে পুঁজি বিনিয়োগে ভাটা পড়ে, উৎপাদন কমে যায়, শ্রমিক ছাঁটাই হয়, ব্যবসায়ে সৃষ্ট হয় মন্দা। এভাবে পুঁজির চাহিদা খুব কমে যাওয়ায় ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে দেয়। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা নতুন করে ঋণ নিয়ে তখন উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দেয়। ক্রমে মন্দা কেটে গিয়ে পুনরায় তেজীভাবের সৃষ্টি হয়। এইভাবে বাববার মন্দা ও তেজীর সৃষ্টি অর্থনীতি ও জনকল্যাণের জন্যে যে অত্যন্ত অশুভ ও ভয়াবহ পরিণতির জন্ম দেয় সে বিষয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তারাও একমত।

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সুদ আসলেই অর্থনীতির জন্যে অপরিহার্য নয়, সঞ্চয়ের জন্যে তো নয়ই। বরং তা অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। সুদনির্ভর পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা ও বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ লর্ড জন মেনার্ড কীনস তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'The General Theory of Employment, Interest and Money'-তে প্রমাণ করেছেনে যে, সঞ্চয়ে সুদের কোন ভূমিকা নেই। সুদ বিদ্যমান না থাকলেও লোকে ব্যক্তিগত কারণেই অর্থ সঞ্চয় করবে। দুর্দিনের খরচ ও আকস্মিক বড় ধরনের ব্যয় মেটাবার প্রয়োজনেই তারা সঞ্চয় করে।

(২০) সুদ ধনবন্টনের অসমতার কারণ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। কীন্‌স দেখিয়েছেন সুদের জন্যেই বরং বিনিয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে। যেকোন দেশের অর্থনীতির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সুদের উচ্চ হারের সময়ে বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াস সংকুচিত হয়েছে। অপরদিকে সুদের হার যখন ন্যূনতম তখনই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সংগে অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াসও বেড়ে গেছে। এসব হ'তে বুঝতে বাকি থাকে না যে, সুদ অর্থনৈতিক সাম্যেরই শুধু বিরোধী নয়, অগ্রগতিরও বিরোধী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি, সমাজ ও অর্থনীতির জন্যে সুদ কি ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে। সুদের যে সব অপকার বা অকল্যাণকর দিক উপরে আলোচিত হ'লো সেসব ছাড়াও সুদের নৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্বিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। এখানে সেসবের বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। সুদনির্ভর অর্থনীতি প্রকৃতপক্ষে কতদূর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হ'তে পারে এবং কি উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা সুদ হারাম করেছেন তা তুলে ধরাই ছিল এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্য।

বস্তুতঃ অর্থনীতি সুদবিহীন হ'লে বিনিয়োগের জন্যে যেমন অর্থের অব্যাহত চাহিদা থাকবে তেমনি সঞ্চয়েরও সদ্ব্যবহার হবে। এর ফলে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সম্পদের সুষম বন্টন ঘটবে। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। একচেটিয়া কারবার হ্রাস পাবে। অতি মুনাফার সুযোগ ও অস্বাভাবিক বিনিয়োগ প্রবণতা দূর হবে। এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন ও বড় ধরণের শোষণের পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যেই ইসলাম সুদকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেছে। বস্তুতঃ যুলুম ও বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হ'লে তার উৎসকেই সমূলে বিনাশ করতে হয়। সেটাই বৈজ্ঞানিক পন্থা।

সুদ উচ্ছেদের উপায়

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যেখানে দীর্ঘদিন ধরে সুদভিত্তিক অর্থনীতি চালু রয়েছে সেদেশে কিভাবে সুদ উচ্ছেদ করা সম্ভব? সুদের অভিশাপ মুক্ত হয়ে কিভাবে ইসলামের অর্থনৈতিক সুবিচারের ছায়াতলে আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে? এজন্যে নীচে

উল্লেখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যায়। আমাদের বিশ্বাস যদি প্রচেষ্টায় আমরা আন্তরিক ও যত্নবান হই তাহ'লে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম রহমতের ছায়াতলে আমাদের ঠাঁই দেবেন।

(ক) ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপনঃ

এ কথা আজ অবিসংবাদী সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত যে, বর্তমানে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি শুধু সফলই প্রমাণিত হয়েছে তাই নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলির চাইতে অধিকতর যোগ্যতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্যে আজ অমুসলিম দেশে, এমনকি অমুসলিম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ও ইসলামী ব্যাংক ও বিনিয়োগ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর বড় উদাহরণ লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক দশকেরও বেশী আগে এবং সাফল্যের সাথে ব্যাংকটি কাজ করে যাচ্ছে। আরও দুটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৫ সালে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হ'লো এদেশের জনগণের মন-মানসিকতা প্রবলভাবে ইসলামমুখী অথচ বিদ্যমান আইন কাঠামো, সমাজ ব্যবস্থা এমনকি ব্যবসায়ীদের অধিকাংশেরই মন-মানসিকতা ইসলাম বিরোধী। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও রোমান-বৃটিশ আইন দ্বারাই আজও এদেশের ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই প্রতিকূল অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখেই বলা যায়, বাংলাদেশে আরও ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন এবং সেসবের সেবা গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া অত্যাবশ্যক। উপরন্তু জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ইসলামী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবী।

(খ) করযে হাসানা ও মুযারিবাত ব্যবস্থার প্রবর্তনঃ

সমাজে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি এবং বিত্তহীন দক্ষ ও যোগ্য লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে 'করযে হাসানা' ও মুযারিবাত পদ্ধতি। ইসলামী সমাজের এই অপরিহার্য বিধানটি এদেশে অনুপস্থিত। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, এমনকি সংখ্যালঘু মুসলমানের দেশ শ্রীলংকাতেও মসজিদভিত্তিক করযে হাসানা প্রদান ও সোসাইটি ভিত্তিক মুযারিবাত ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই এ দু'টি দেশে মুসলমানরা কিছুটা হ'লেও নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাচ্ছে। এ দেশেও এই ব্যবস্থা আশু চালু করা প্রয়োজন। সমাজের বিত্তশালী লোকদের করযে হাসানা দেওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই উদ্যোগ যদি মসজিদ কেন্দ্রিক হয় তাহ'লে সত্যিকার যোগ্য লোককে যেমন সুযোগ দেওয়া যাবে তেমনি এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের পাশাপাশি সমাজ সচেতনতা ও সমাজকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

মুযারাবা পদ্ধতি এদেশে চালু করতে সময়ের প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন হবে আইন কাঠামো বদলানোর পাশাপাশি উত্তম চরিত্রের লোক সৃষ্টির। উত্তম ও যোগ্য লোকেরা মুযারাবার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি উভয়বিধ উপায়েই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করত পারে। এজন্যে প্রতিবেশী দেশগুলির মতো সোসাইটি গঠন করে তার মাধ্যমে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। উপরন্তু সমাজের বিত্তশালী লোকদের মনোভাব পরিবর্তনের জন্যে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন তাদের ইসলামী অনুশাসন জানতে ও অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। করযে হাসানা দিলে সেই অর্থের জন্যে আয়কর দিতে হবে না এবং মুযারাবার ক্ষেত্রে ছাহেব আল-মালকে মুনাফার নির্দিষ্ট পরিমাণের উর্ধ্বের জন্যে আয়কর দিতে হবে এমন আইন করে বিত্তশালী মুসলিমদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব।

(গ) পাঠ্যসূচীতে ইসলামী অর্থনীতি চালু করাঃ

বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু জনগণের তথা মুসলমান জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, শিক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের ঈমান ও আক্বীদার কোন সংশ্রব নেই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষার কথা বাদ দিলে উচ্চতর শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার কোন পর্যায়েই ইসলাম যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তা জানার ও অনুশীলনের কোনো সুযোগ নেই। এই অবস্থার নিরসন হওয়া দরকার। দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচীতে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আক্বীদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হ'তে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি সকল শিক্ষাক্রমে ইসলামী অর্থনীতি পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আজ পৃথিবীর বহু মুসলিম দেশে তো বটেই, অমুসলিম দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও ইসলামী অর্থনীতির পাঠ দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ এদের সবার পেছনে। দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের পাঠ্যক্রমে বিক্ষিপ্তভাবে কোন কোন পত্রে 'ইসলাম' শব্দ জুড়ে দিয়ে এই দায় সারা হচ্ছে। অথচ প্রয়োজন গোটা পাঠ্যসূচীর সংস্কার। যারা আগামী দিনে এদেশের প্রশাসন, বিচার-আইন ব্যবসা-বাণিজ্য ও কল-কারখানার কর্ণধার হবে তাদের যদি এখনই সুদী অর্থনীতির কুফল ও ধ্বংসাত্মক দিক সম্বন্ধে অবহিত করা না যায় এবং পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতির

গঠনমূলক ও হিতকর দিকগুলো জানানো না যায় তাহ'লে জাতি যে তিমিরে রয়েছে সেই তিমিরেই রয়ে যাবে।

(ঘ) গণসচেতনতা সৃষ্টিঃ

ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবল ইসলামী অর্থনীতি অর্জনের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হ'তে পারে। জনগণের চাহিদা এবং তার দৃঢ় বহিঃপ্রকাশ ছাড়া সরকার নিজ থেকে খুব কমই তাদের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকে। ইসলামী অর্থনীতি চালু বা বাস্তবায়ন করা হবে প্রচলিত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্যে সবার আগে চাই গণসচেতনতা। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ নিরক্ষর। সেজন্যে কাজটা একটু কঠিন ও আয়াসসাধ্যও বটে, তবে অসম্ভব নয়। কারণ এদেশের জনগণ ধর্মভীরু এবং সরল প্রকৃতির। তাদের যদি যথাযথভাবে ইসলামের দাবী কি এবং তা অর্জনের উপায় কি এটা বোঝানো যায়, প্রকৃতই উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহ'লে এদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোয় ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন সময় সাপেক্ষ হ'তে পারে কিন্তু অসম্ভব নয়। এজন্যে দু'টো উপায় অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ মসজিদে খুৎবার সাহায্য গ্রহণ। বছরে বায়ান্ন দিন এলাকার জনগণ মসজিদে জুম'আর ছালাতে শামিল হন। এই ছালাতের খুৎবায় নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সেই সব বিষয়ের পাশাপাশি যদি খত্বীব বা ইমাম ছাহেব সুদী অর্থনীতির কুফল এবং দেশ ও জাতির জন্যে তা কতখানি ক্ষতিকর বুঝিয়ে বলেন তাহ'লে ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয়তঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ায মাহফিল, তাফসীর মাহফিল ও ইসলামী জালসায় বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম ও মুফাসসিরে কুরআনগণ বক্তৃতা করে থাকেন। ঐসব অনুষ্ঠানে হাযার হাযার লোকের সমাগম হয়। তারা নানা বয়স ও পেশার, শিক্ষা ও সামাজিক পদ মর্যাদার। ঐসব অনুষ্ঠানে যদি ইসলামী অর্থনীতির উপযোগিতা এবং সুদী অর্থনীতির কুফল সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝিয়ে বক্তব্য রাখা যায় তাহ'লে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, জনমত গড়ে উঠবে তার ধাক্কাতেই সুদী অর্থনীতি উৎখাত হ'তে পারে, বাস্তবায়িত হ'তে পারে ইসলামী অর্থনীতি। এর জন্যে চাই দীর্ঘ মেয়াদী সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা।

(ঙ) গণপ্রতিরোধ গঠনঃ

উপরে বর্ণিত উপায়গুলি ছাড়াও সুদ নির্মূল করার আরও কয়েকটি ছোট-খাট উপায় রয়েছে। এগুলি সবই অবশ্য জনগণ নির্ভর। জনগণ গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে সুদের বিরুদ্ধে, সুদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে। এই প্রতিরোধ যতই ব্যাপক ও দুর্বার হবে সুদের নাগপাশ ততই দ্রুত খসে পড়তে বাধ্য। এইসব পদক্ষেপের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা গেল।-

১. সুদখোরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। সমাজে যারা সুদখোর বলে পরিচিত, তাদের পরিচিতি যাই হৌক না কেন ধীরে ধীরে তাদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে। তারা যেন বুঝতে পারে যে, সুদের সংগে সংশ্রব থাকার কারণেই জনগণ তাদের সংগে বর্জন করছেন বা তাদের এড়িয়ে চলছেন। কাজটা প্রথমে কঠিন মনে হ'তে পারে কিন্তু সকলে মিলে এগিয়ে এলে মোটেই দুঃসাধ্য নয়।

২. সুদখোরদের জনপ্রতিনিধি না বানানো। সুদখোরদের কোন জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কাজে নির্বাচিত হ'তে দেওয়া হবে না। তারা ভোটে প্রার্থী হ'লে তাদের যেন ভোট না দেওয়া হয় সেজন্যে জোর প্রচারণা চালাতে হবে। জনগণকে বুঝাতে হবে যে, এইসব লোকের কার্যক্রমের জন্যেই সমাজে শোষণ-নির্যাতন-নিপীড়ন চিরকাল জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকবে।

৩. সুদখোরদের সামাজিকভাবে বয়কট করা। যারা সুদের ব্যবসা করে, গ্রামে মহাজনী কারবারের (গ্রামাঞ্চলে সুদী ব্যবসার সামাজিক নাম) সাথে যারা যুক্ত তাদের ছেলে-মেয়ের সাথে নিজেদের ছেলে-মেয়ের বিয়ে না দেওয়া এবং তাদের জানাযা না পড়ানোও উত্তম প্রতিষেধকের কাজ করতে পারে। বাংলাদেশেই আজ হ'তে পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে গ্রামাঞ্চলে সুদখোরের দাওয়াত কেউ সহজে গ্রহণ করতে চাইতো না। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির দাপটে এবং দ্বীনি শিক্ষা বঞ্চিত হওয়ার কারণে আজ সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

৪. সরকার যেসব ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সুদ প্রদান বাধ্যতামূলক করে রেখেছে সেগুলো রহিত করার জন্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা। উদাহরণতঃ জমির খাজনা যথাসময়ে দিতে না পারলে তার উপর সুদ (এমনকি চক্রবৃদ্ধি হারেও) দিতে হয়। সুদের বদলে সরকার জরিমানা আরোপ করতে পারে। ঈমান ও আক্বীদা বিরোধী সুদ কেন দিতে হবে? অনতিবিলম্বে সরকার যেন খাজনার খাত থেকে সুদ প্রত্যাহার করে নিতান্তই অপরিহার্য ক্ষেত্রে জরিমানার ব্যবস্থা চালু করে সেই লক্ষ্যে জনমত গঠন করা উচিৎ।

আশা করা যায়, এসব উপায় অনুসরণের মধ্য দিয়ে এদেশে সুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হবে, আল্লাহ ঘোষিত হারাম বর্জনের জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস সূচিত হবে। পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্যেও আপামর জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ নিজ সাধ্যমতো দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হবে। বস্তুতঃ আমাদের দায়িত্বই হচ্ছে চেষ্টা করা এবং তার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই প্রয়াসে তিনি আমাদের সহায় হৌন এই হৌক আমাদের আকুল প্রার্থনা।

যঈফ ও জাল হাদীছ এবং মুসলিম সমাজে তার কুপ্রভাব

*-আখতারুল আমান**

ইসলামী শরীয়তের দু'টি মূল উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। মহানবী (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঐ দু'টিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টি হ'ল আল্লাহ্র কিতাব (আল-কুরআন) এবং রাসূল (ছাঃ) -এর সুন্নাত (আল-হাদীছ)'।[১]

যেহেতু উপরোক্ত দু'টি উৎসই ইসলামী জীবন-যাপনের মূল হাতিয়ার এবং এর উপরেই মুসলমানদের হেদায়াত নির্ভরশীল, সেহেতু যুগ পরম্পরায় ইসলামের শত্রুরা এ দু'টি মূল উৎসের মাঝেই ভেজাল ঢুকানোর চেষ্টা করেছে। কুরআন যেহেতু মহানবী (ছাঃ)-এর সময়েই লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিল। কণ্ঠস্থ ছিল বহু ছাহাবীর। কাজেই তারা কুরআনে হাত দেওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ ছিল এর কিছুটা ব্যতিক্রম। হাদীছ তখন লিখিত আকারে ছিল না। ছিল বিভিন্ন ছাহাবীর স্মৃতিপটে সংরক্ষিত। তাও আবার গচ্ছিত আকারে নয়। লিখিত আকারে খুব কমই সংরক্ষিত ছিল। এই সুযোগে ইসলামের চির শত্রুরা ও মুসলিম নামধারী বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল এই দ্বিতীয় উৎসের মধ্যে তাদের কালো হাত বসিয়েছে। হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম এবং যা শরীয়ত নয় তাকে শরীয়তে রূপ দেওয়ার জন্য বহু হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম দিয়ে জাল করেছে। কিন্তু মহান রাব্বুল 'আলামীন যুগে যুগে এমন পণ্ডিতদেরও আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, যাঁরা ঐ সমস্ত যঈফ ও জাল হাদীছগুলিকে ছাঁটাই-বাছাই করতে সক্ষম হয়েছেন।

ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন, যখন কারো পক্ষে কুরআন মজীদে অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্ভব হয়নি, তখন কিছু সংখ্যক লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ধিত করতে শুরু করে এবং তিনি বলেননি এমন কথাও তাঁর নাম দিয়ে চালাতে শুরু করে। আর এর প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা এমন আলেমদের আবির্ভাব ঘটালেন, যাঁরা মিথ্যা বর্ণনা অপসারণ করতে শুরু করেন এবং ছহীহ হাদীছ কোন্‌টি তা স্পষ্ট করে দেন। আল্লাহ তা'আলা এরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিদের থেকে কোন যুগকেই শূন্য রাখেননি। তবে এ ধরনের ব্যক্তিত্বদের অস্তিত্ব সাম্প্রতিককালে হ্রাস পেয়েছে। এমনকি বর্তমানে তাদের প্রাপ্তি পশ্চিমা 'ডলফিন' প্রাপ্তির চেয়েও দুর্লভ হয়ে পড়েছে।[২]

ইমাম ইবনুল জাওযীর যুগেই যখন হাদীছের মহাপণ্ডিতদের এরূপ অভাব দেখা দিয়েছিল, সেখানে বর্তমান যুগে এ অভাব আরো তীব্র হওয়া স্বাভাবিক নয় কি? বাস্তব পরিস্থিতিও তাই। সারা বিশ্বে আজ যঈফ ও জাল হাদীছের ছড়াছড়ি। কি খত্বীব, কি ওয়ায়েয, কি প্রবন্ধকার, কি তথাকথিত মুহাদ্দিছ সকলের মুখে শুধু যঈফ ও জাল হাদীছ শুনা যায়। কিন্তু এগুলি থেকে সতর্ককারী রয়েছেন ক'জন? যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী সহ হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তিত্ব ছাড়া? তাদের লেখনীও আবার আরবীতে। যা বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য বুঝা কষ্টকর।

এই ঘোলাটে পরিস্থিতি অনুধাবন করেই আমরা উভয় বাংলার মানুষকে যঈফ ও জাল হাদীছ থেকে সতর্ক করার জন্য কলম হাতে নিয়েছি। আমরা বাংলার মুমিন সমাজকে জানিয়ে দিতে চাই যে, হাদীছ বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। হাদীছের অবস্থা না জেনে তা দিয়ে দলীল পেশ করা যাবে না। আমরা আরো চাই বাংলার মানুষকে ঐ সমস্ত হাদীছের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে, যেগুলিকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ কিংবা ঐ রকম বই-কিতাব না থাকায় ছহীহ হাদীছ জ্ঞান করে আমল করে আসছে। অথচ তা নিতান্তই যঈফ বা জাল। বহুকাল আগে থেকেই হাদীছ শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ এগুলোকে যঈফ ও জাল হাদীছ বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং বর্তমান যুগের হাদীছশাস্ত্রবিদগণও ওগুলোর যঈফ ও জাল হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে মহানবী (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করার কঠিন গোনাহ হ'তে রক্ষা করা।

যঈফ ও জাল হাদীছের সংজ্ঞাঃ

যঈফ হাদীছঃ যে হাদীছে ছহীহ* ও হাসান** হাদীছের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকেই 'যঈফ' হাদীছ বলে।[৩]

জাল হাদীছঃ ঐ মিথ্যা হাদীছকে বলে, যা বানানো হয়েছে এবং নবী (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।[৪]

---

* ফারেগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা ও দাঈ, জুবাইল দা'ওয়া সেন্টার, কুয়েত।

১. মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, মিশকাত হা/১৮৬; আল-মুস্তাদরাক লিল হাকেম, সনদ হাসান, প্রাগুক্ত, টীকা নং ১।

২. সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যাঈফাহ ওয়াল মওযূ'আহ ১/৪১।

৩. ইমাম নববী, মুক্বাদ্দামাহ মুসলিম পৃঃ ১৭; হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, (ইফাবা ১৯৯২) পৃঃ ৩৯।

৪. ডঃ মাহমূদ আত-ত্বাহহান, তায়সীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ, পৃঃ ৮৯।

* **ছহীহ হাদীছের সংজ্ঞাঃ** ছহীহ হাদীছ ঐ হাদীছকে বলা হয় যার বর্ণনাসূত্র ধারাবাহিক রয়েছে এবং বর্ণনাকারীগণ সর্বতোভাবে ন্যায়পরায়ণ। যাদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং যে হাদীছের মধ্যে কোন প্রকার দোষ নেই এবং অপর ছহীহ হাদীছের বিরোধীও নয়। (মিন আত্বয়াবিল মিনাহ ফি ইলমিল মুছত্বালাহ ও শরহে নুখবাতুল ফিক্র অবলম্বনে)।

** ছহীহ হাদীছের সকল গুণ বিদ্যমান থাকার পর বর্ণনাকারীদের স্মরণশক্তি যদি কিছুটা হালকা প্রমাণিত হয় তবে তাকে হাসান হাদীছ বলা হয়। (প্রাগুক্ত)।

হাদীছ বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বনঃ

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নির্দোষ রাবীর হাদীছ গ্রহণ করতে হবে। পক্ষান্তরে যে রাবী দোষী সাব্যস্ত হবে, তার বর্ণিত হাদীছ প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا-

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে কোন ফাসেক ব্যক্তি কোন খবর দিলে তা যাচাই কর' (হুজুরাত ৬)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ 'যে ব্যক্তি আমার থেকে এমন হাদীছ বর্ণনা করে যে, তার ধারণা হয় ওটা মিথ্যাও হ'তে পারে, তবে সে অন্যতম সেরা মিথ্যুক' (মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ 'একজন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই (পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে) বলে বেড়াবে' (মুক্বাদ্দামা মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপরে মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়' (বুখারী ও মুসলিম)।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছগুলি দ্বারা এটাই প্রতিভাত হয় যে, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ঢালাওভাবে হাদীছ বর্ণনা করা যাবে না। বরং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে হাদীছটি সত্যিকার অর্থে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ কি-না। 'যে ব্যক্তি শুনামাত্রই বর্ণনা করে সে অন্যতম সেরা মিথ্যুক' এবং 'জেনে বুঝে মিথ্যারোপ করলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম', এ বাক্যগুলো থেকে হাদীছের ছহীহ-যঈফ যাচাই কতটুক আবশ্যক তা সহজেই অনুমেয়।

ছহীহ-যঈফে যিনি পার্থক্য করতে জানেন না, তিনি আলেম ননঃ

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইসহাক বিন রাহওয়াইহ বলেন, যে আলেম হাদীছের ছহীহ-যঈফ ও নাসেখ-মানসূখ জানেন না, তাকে আলেমই বলা চলে না'।[৫]

ছিহাহ সিত্তাহ বলা কতদূর সঠিক?

আমরা বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এসব মহামতি ইমামদের হাদীছগ্রন্থগুলিকে 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলে থাকি। যার অর্থ হাদীছের ছয়টি ছহীহ কিতাব। আসলে কি এ ছয় খানি কিতাবই ছহীহ হাদীছের কিতাব? একমাত্র ছহীহ হাদীছের কিতাব বলতে বুখারী ও মুসলিমকে বুঝানো হয়। যে দু'টিকে একত্রে **'ছহীহায়েন'** বলা হয়। এই দুই কিতাবের সাথে অনেক বিদ্বান মুওয়াত্ত্বা মালেককেও শামিল করেছেন। এর বাইরে কোন কিতাবই নিরংকুশ ছহীহ হাদীছের কিতাব নয়। বরং সব হাদীছের কিতাবেই ছহীহ-যঈফ মিশ্রিত রয়েছে। আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এ চারটি কিতাবে যঈফ হাদীছ মিশ্রিত রয়েছে। সুতরাং এগুলিকে বুখারী ও মুসলিমের সাথে মিলিয়ে ছিহাহ সিত্তাহ বলা মারাত্মক ভুল।

বিদ্বানদের গণনামতে ঐ চারটি কিতাবে যঈফ হাদীছের সংখ্যা তিন হাযারের ঊর্ধ্বে রয়েছে। যেমন মুহাদ্দিছ আলবানী (রহঃ)-এর চারটি যঈফ সুনান গ্রন্থ অবলম্বনে বলা যায়-

নাসাঈতে	যঈফ	হাদীছের	সংখ্যা	প্রায়	৪৪০
আবুদাঊদে	"	"	"	"	১১২৭
তিরমিযীতে	"	"	"	"	৮২৯
ইবনু মাজাহ্‌তে	"	"	"	"	৯৪৮
				মোট=	৩৩৪৪

এই চার খানা কিতাবকে পুরাপুরিভাবে ছহীহ হাদীছের সংকলন জ্ঞান করার কারণেই আমরা এগুলোর মধ্যে সন্নিবেশিত হাদীছগুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিনা বা করার প্রয়োজন মনে করি না। অথচ এটিও একটি মারাত্মক ভুল।

আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইয়ামানী বলেন,

و أما سنن ابن ماجة فإنها دون هذين الجامعين والبحث عن أحاديثها لازم و فيها حديث موضوع فى الفضائل -

'সুনানে ইবনে মাজাহ আবূদাঊদ ও নাসাঈর পরবর্তী পর্যায়ের গ্রন্থ। উহার হাদীছসমূহে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো আবশ্যক। উহাতে ফযীলত সংক্রান্ত অধ্যায়ে একটি মওযূ হাদীছ রয়েছে'।[৬]

---

৫. মা'রেফাতু উলূমিল হাদীছের বরাতে ছহীহুত তারগীব-এর ভূমিকা পৃঃ ১৩।

৬. হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, (ইফাবা, ১৯৯২), পৃঃ ৫৬১ ॥ গৃহীতঃ তানক্বীহুল আনওয়ার।

উপরোক্ত চারখানি কিতাবের বাইরেও এমন অনেক কিতাব রয়েছে যার বেশীর ভাগ হাদীছ ছহীহ। যেমন ছহীহ ইবনু খুযায়মা, ছহীহ ইবনু হিব্বান প্রভৃতি। মোটকথা হাদীছের প্রসিদ্ধ ছয় খানা কিতাবকে **'ছিহাহ সিত্তাহ'** না বলে **'কুতুবু সিত্তাহ'** বা **'ছহীহাইন'** ও **'সুনানে আরবা'আহ'** বলা উচিত।

প্রকাশ থাকে যে, অনেকে মনে করেন, যঈফ হাদীছ ফযীলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। বরং ফযীলত ও আহকাম সর্বক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ বর্জনীয়। ইহাই মুহাক্কিক্বীন বিদ্বানদের চূড়ান্ত ফায়সালা। আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী বলেন, ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মঈন, ইবনুল আরাবী, ইবনে হাযম এবং ইবনু তাইমিয়াহ প্রমুখ মনীষীগণ বলেন, ফযীলত কিংবা আহকাম কোন ব্যাপারেই যঈফ হাদীছ আমল যোগ্য নয়।[৭]

পরিশেষে আল্লাহ আমাদের সকলকে যঈফ ও জাল হাদীছ চিনার ও তা থেকে সতর্ক থাকার সাথে সাথে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল করার তাওফীক দিন- আমীন!

[আগামীতে ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। -সম্পাদক]

৭. *কাওয়ায়েদুত তাহদীছ পৃঃ ৯৫; গৃহীতঃ মাসিক আত-তাহরীক, মে'৯৮ ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা।*

আয়েশা ক্লিনিক

এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা অস্ত্রপচার ও ডেলিভারী করা হয়। এক্স-রে, ই,সি,জি আলট্রাসনগ্রাফী ও প্যাথলজীর সু-ব্যবস্থা আছে।

পরিচালকঃ **নূর মহল বেগম**

ঠিকানাঃ গ্রেটার রোড, কদমতলা, রাজশাহী।
ফোন ঃ ৭৭৩০৫৩ (অনুঃ)

প্রচলিত সমাজ বনাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ

*-কামরুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

উপক্রমণিকাঃ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কেতন বাহক, পাতকীর ত্রাণকর্তা হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) অন্ধকারাচ্ছন্ন পাপ পঙ্কিলময় বসুন্ধরায় সত্যের দীপ্ত আলোকোজ্জ্বল মশাল হাতে নিয়ে জাহেলিয়াতের সকল কুসংস্কার বিদূরিত করে তাঁর উপর অবতারিত অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র মানদন্ড আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র আলোকে সমাজের পূর্ণ সংস্কার সাধন করে বিশ্বের সর্বোত্তম ও অবিস্মরণীয় অনুপম আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। যে সমাজের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে The Quran in everyday life গ্রন্থকার লিখেছেন, "All individual, Social, Political, Finential and others problems which relating with human being, human welfare or human nature have been completely discussed in the Quran".[১]

আল-কুরআন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর কর্ম ও অমীয় বাণী ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজের একমাত্র দিকদর্শন। এককথায় বলা যায় যে, কুরআন ও হাদীছের বিধানাবলী পরিপূর্ণভাবে বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে। যা পরিপূর্ণ অমলীন ছিল ছাহাবায়ে কেরামদের (বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণযুগ) পর্যন্ত। তারপর থেকে ক্রমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ্র আদর্শ হ'তে পদস্খলিত হয়ে কালক্রমে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দল, উপদল ও ফির্কায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন অনৈসলামিক আদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং প্রচলিত সমাজের বহুলাংশে মানুষ ইসলাম হ'তে ছিটকে পড়ে। তাই আজকের এই সামান্য মসী চালনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

প্রোক্ত রচনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত অনুপম আদর্শ সমাজ এবং প্রচলিত ঘুনে ধরা সমাজের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হব যে, আমরা কতটুকু ইসলামী আদর্শ হ'তে ছিটকে পড়েছি। যেহেতু রচনার প্রতিপাদ্য বিষয় হ'লো সমাজ। তাই সমাজ -এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

সমাজের সাধারণ সংজ্ঞাঃ সাধারণতঃ সমাজ বলতে পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝায়। সুতরাং সমাজ বলতে আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বুঝে থাকি, যা মানুষ নিজের

* *কামিল প্রথম বর্ষ, আরামনগর আলিয়া মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।*

১. *Al-Quran note, (Dhaka: Islamic education development center), p. 1.*

অস্তিত্বের প্রয়োজনে তৈরী করে। মানুষের জীবনধারণ, পরস্পরের ভাব আদান-প্রদান, ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠা প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠে তাই সমাজ।

প্রামাণ্য সংজ্ঞাঃ বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেগের ভাষায় 'সমাজ হ'লো আচার ও কার্যপ্রণালী, কর্তৃত্ব এবং পারস্পরিক সাহায্য, নানা রকম সমবায় এবং বিভাগ, মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা এসব কিছুর দ্বারা গঠিত প্রথা'। প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী গিডিংসের মতে, 'সমাজ হ'লো সাধারণ স্বার্থপ্রণোদিত এমন একটি জনসমষ্টি, যার সদস্যরা অভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য পরস্পরের সহযোগিতা করে'।

বৈশিষ্ট্য ও পরিধিঃ সমাজের পরিধি রাষ্ট্রের পরিধির চেয়েও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। যা বিশ্বব্যাপীও হ'তে পারে। যেমন- মুসলিম সমাজ। সমাজ মানব জীবনের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে।

তুলনামূলক পর্যালোচনা

(১) সাম্প্রদায়িক বিভক্তিঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে কোন সাম্প্রদায়িক দল ও উপদলের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু প্রচলিত সমাজ বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দল ও উপদলে বিভক্ত। যেমন- শী'আ, সুন্নী, জাব্‌রিয়া, ক্বাদারিয়া, জাহমিয়া, মু'তাযিলা, মুরযিয়া, নকশ্‌বন্দিয়া, চিশ্‌তিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া, রাফেযী, খারেজী, হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী এভাবে ১৭২ ফির্কায় বিভক্ত মুসলিম সমাজ।[২]

(২) পরগৃহে প্রবেশনীতিঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে পরগৃহে প্রবেশ করার জন্য সালাম ও অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হ'ত। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا.....فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا –

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না দাও....। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে' (নূর ২৭-২৮)।

ছাহাবীগণ সালাম দিয়ে অনুমতি না পেলে পরগৃহে প্রবেশ করতেন না এবং ফিরে আসতেন।[৩]

কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, প্রচলিত সমাজের দিকে তাকালে মনে হয় যেন এই শ্বাশত বিধান রহিত হয়ে গেছে। ফলে বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণা হচ্ছে।

(৩) দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে কেউ কারো সম্মানে দাঁড়াতেন না। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মানের ক্ষেত্রেও না। কেননা রাসূল (ছাঃ) এভাবে দাঁড়ানোকে পসন্দ করতেন না। আনাস (রাঃ) বলেন, 'ছাহাবায়ে কেরামদের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিলেন না। অথচ তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখতেন, তখন দাঁড়াতেন না। কেননা তাঁরা জানতেন, তিনি ইহা পসন্দ করেন না'।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি এতে আনন্দ পায় যে, লোকজন তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে করে লয়'।[৫]

কিন্তু প্রচলিত সমাজে অফিস-আদালতে নিম্নপদস্থ উচ্চপদস্থের সম্মানে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা শিক্ষকদের সম্মানে, সমাজে গণ্যমান্য মুরুব্বী ও পীর-মাশায়েখ-এর সম্মানে দাঁড়ানো হয়, যা সম্পূর্ণ রাসূল (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিপরীত।

(৪) সালাম বিনিময়ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে মুসলমানগণ পরস্পর সাক্ষাতে পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করতেন। কেননা তাঁরা ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের মূর্ত প্রতীক। আর রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف 'পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে'।[৬]

কিন্তু প্রচলিত সমাজে সালামের প্রচলন নেই বললেই চলে। বরং উচ্চ ফ্যামিলিতে সালামের পরিবর্তে ইহুদী-নাছারাদের মত Good morning, Good evening, Good night বলে অভ্যর্থনা জানানো হয়। আবার কেউ কেউ সালাম উচ্চারণ না করে ইহুদী-নাছারাদের মত শুধু হাতের ইশারায় সালাম করে, যা সম্পূর্ণ রাসূল (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজের পরিপন্থী।

(৫) বিদায় সম্ভাষণঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে বিদায় সম্ভাষণ জানানো হ'তো সালামের মাধ্যমে। রাসূল (ছাঃ) ছাহাবাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যখন তোমরা বিদায় নিবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করবে'।[৭]

---

২. *নাজির আহমাদ, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, (ঢাকাঃ আরাফাত প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯৫ খৃঃ), পৃঃ ২৩৬-৩২৫।*

৩. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত-আলবানী হা/৪৬৬৭।*

৪. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৯৮, সনদ ছহীহ।*

৫. *আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৯৯, সনদ ছহীহ।*

৬. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৯।*

৭. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৬৫১।*

কিন্তু প্রচলিত সমাজে বিদায় সম্ভাষণ জানানো হয় নাছারাদের মত হাতের তালু দিয়ে টা-টা-র মাধ্যমে।

(৬) গীবত বা পরনিন্দাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজ ছিল গীবত বা পরনিন্দা মুক্ত, শান্তিময়, সুশৃংখল সমাজ। কেননা রাসূল (ছাঃ) অহি-র মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, – وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ 'দুর্ভোগ ঐসব লোকের জন্য যারা সম্মুখে ও পশ্চাতে পরনিন্দা করে' (হুমাযাহ ১)। আরো ইরশাদ হচ্ছে, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 'একে অন্যের অগোচরে দুর্ণাম করো না' (হুজুরাত ১২)।

কিন্তু প্রচলিত সমাজে পরনিন্দা এমন ব্যাপক হারে চলছে যে, সমাজে বিশৃংখলা, অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ লেগেই থাকে। কেননা পরনিন্দা সমাজ দূষণের অন্যতম সেরা হাতিয়ার।

(৭) কু-ধারণাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে কেউ কারো প্রতি কু-ধারণা পোষণ করত না। কেননা রাসূল (ছাঃ) অহি-র মাধ্যমে কু-ধারণা হ'তে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ –

'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গোনাহ' (হুজুরাত ১২)।

কিন্তু প্রচলিত সমাজের সর্বত্র কু-ধারণা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্ট, ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনার সৃষ্টি হচ্ছে।

(৮) দোষারোপঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে কেউ কারোর প্রতি দোষারোপ করত না। কেননা রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ প্রেরিত অহি-র মাধ্যমে হুঁশিয়ার করেছেন, وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ 'তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না' (হুজুরাত ১১)।

কিন্তু প্রচলিত সমাজে একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করা এমনকি নিজের দোষ অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

(৯) গোপনীয়তার অনুসন্ধানঃ প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে। খারাপ ধারণার বশীভূত হয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে কাউকে ক্ষতি করার জন্য অথবা নিজের কৌতুহল বা উৎসুক নিবারণের জন্য অন্যের ত্রুটি অনুসন্ধানে গোয়েন্দাগিরি করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَجَسَّسُوْا 'তোমরা কারোর গোপন রহস্য অনুসন্ধান করো না' (হুজুরাত ১২)। তাই রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজে কেউ কারোর গোপনীয়তার অনুসন্ধান করত না।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় প্রচলিত সমাজে অপরের গোপন রহস্য জানার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। যেমন- কারো ঘরে উঁকি দেওয়া, কারো বিষয়াদি কৌশলে জানতে চেষ্টা করা, অন্যের চিঠি পড়া ইত্যাদি।

(১০) নিকৃষ্ট সম্বোধনঃ সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য কাউকে নিকৃষ্ট বিশেষণে বিশেষিত করা, নিন্দাবাদ, কুৎসা রটনা ও মন্দ নামে ডাকা হ'তে বিরত থাকার জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ 'তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না' (হুজুরাত ১১)। তাই রাসূল (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে কেউ কাউকে নিকৃষ্ট নামে ডাকতো না। কিন্তু প্রচলিত সমাজের সর্বত্রই দেখা যায় নিকৃষ্ট সম্বোধনের ছড়াছড়ি।

(১১) ঠাট্টা-বিদ্রুপঃ ঠাট্টা-বিদ্রুপের ফলে অন্য কষ্ট পায় ও পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তাই রাসূল (ছাঃ) অহি-র মাধ্যমে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ 'তোমাদের এক গোত্র যেন অন্য গোত্রের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করে' (হুজুরাত ১১)। তাই রাসূল (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে ঠাট্টা-বিদ্রুপের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু প্রচলিত সমাজে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, হাসি-তামাশা, অভিনয়, ইংগিত, চেহারা নিয়ে কটাক্ষ, অন্যের দোষ নিয়ে হাসাহাসি করা প্রায় সকলেরই স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য।

(১২) বিবাদ বা দ্বন্দ্বঃ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজে মুমিনদের মাঝে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তা ন্যায়সংগতভাবে নিরসন করা হ'তো। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا –

'যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে' (হুজুরাত ৯)।

কিন্তু প্রচলিত সমাজে মুমিনদের মাঝে পারস্পরিক বিরোধ হ'লে নিরসন করা তো দূরের কথা আরো উভয় পক্ষকে উস্কে দেওয়া হয়। যদিও নিরসন করা হয় তা ন্যায় ও ইনসাফের আশ্রয়ে নয়।

(১৩) ভ্রাতৃত্ববোধঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে মুসলমানদের মাঝে এমন ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতি ছিল যেন

তারা একই বৃন্তের সকল ফুল। কেননা ইরশাদ হচ্ছে, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ। 'মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই' (হুজুরাত ১০)। শরীরের একটি অঙ্গে ব্যথা পেলে যেমন সমস্ত শরীরে ব্যথা অনুভূত হয়, ঠিক তেমনি ছাহাবাগণ পরস্পরের ব্যথা বেদনায় সমব্যথিত হ'তেন।

কিন্তু প্রচলিত সমাজে আর সেই ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি নেই। মুসলিম সমাজ এখন নানা দল, মত ও ব্যক্তি স্বার্থে বিভক্ত।

(১৪) অশ্লীলতা-বেহায়াপনাঃ অশ্লীলতা সমাজকে কলুষিত করে। তাই রাসূল (ছাঃ) তাঁর প্রতি প্রেরিত অহি-র মাধ্যমে যাবতীয় অশ্লীলতা-বেহায়াপনা বিদূরিত করে একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ছড়িয়ে পড়াকে পসন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন শাস্তি' (নূর ১৯)।

কিন্তু প্রচলিত সমাজে চলচ্চিত্র, টিভি, ভিসিআর, ডিশ এন্টিনা প্রভৃতির মাধ্যমে অশ্লীল ছায়াছবি, অর্ধ-উলঙ্গ যুবক-যুবতীর সম্মিলিত নৃত্য, সম্মিলিত কণ্ঠে যৌন উত্তেজনামূলক গান, বিশেষ করে চিত্র প্রদর্শনীর নামে নারীদেহ প্রদর্শন, অশ্লীল নোভেল-নাটক, গল্প-কাহিনী, কাব্য-কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে শুধু যুব সমাজকেই নয়, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের ঈমানকেও ধ্বংস করা হচ্ছে।

(১৫) অশালীন পোষাকঃ রাসূল (ছাঃ) নারীদেরকে সর্বাঙ্গ মোটা ও ঢিলা কাপড়ে ঢেকে এবং তার উপর অতিরিক্ত চাদর বা বোরখা পরিধান করে সুগন্ধি না মেখে ঘর থেকে বের হ'তে বলেছেন এবং নারীদেরকে পুরুষের পোষাক ও পুরুষদেরকে নারীদের পোষাক এবং পুরুষদেরকে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। তাই রাসূল (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে রাসূল (ছাঃ) দেয়া বিধি মোতাবেক পোষাক পরিধান করা হ'তো।

কিন্তু প্রচলিত সমাজে নারী পুরুষ এমন আটসেটে, পাতলা, অর্ধ-উলংগ পোষাক পরিধান করে, যাতে বাহ্যত দেহের যৌনাঙ্গগুলি আরো আকর্ষণীয় হয়ে ফুটে উঠে এবং নারীরা এমন তীব্র সেন্ট ব্যবহার করে বাইরে বের হচ্ছে যাতে পুরুষেরা তাদের প্রতি সহসাই আকৃষ্ট হচ্ছে। ফলে ব্যভিচারের দ্বার আরো সুগম হচ্ছে। আর পুরুষেরা টাখ্নুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করাকে আধুনিকতা বলে মনে করছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন, 'যে পুরুষ টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না' (বুখারী ও মুসলিম)।

(১৬) নারীদের বর্হিগমনঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারীদের বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিত এবং সাজসজ্জা করে বাইরে যেতে অহি-র মাধ্যমে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- 'তোমরা (মহিলারা) গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না' (আহযাব ৩৩)। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে নারীরা পর্দাহীন অশালীন পোষাক পরিধান করে এবং বিনা প্রয়োজনে বাইরে যেতো না।

কিন্তু প্রচলিত সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়ায় নারীরা উদাম ও খোলামেলা চলাফেরায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে বিভিন্ন অনাকাঙ্খিত ঘটনার অবতারণা হচ্ছে।

(১৭) যৌতুক ও মোহরানাঃ প্রচলিত সমাজে যৌতুক একটি অন্যতম সামাজিক সংক্রামক ব্যাধি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে যৌতুকের কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং মোহর আদায় ব্যতীত কোন বিয়েই হ'ত না। ইরশাদ হচ্ছে, 'স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে দাও' (নিসা ৪)।

কিন্তু প্রচলিত সমাজে এর সম্পূর্ণ উল্টো প্রথা চালু হয়েছে। মেয়েদের মোহরের পরিবর্তে ছেলেদের মোহর (যৌতুক) নির্ধারিত হচ্ছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মে মেয়েদের জন্য একটি গগনচুম্বী মোহর নির্ধারণ হচ্ছে বটে, কিন্তু শতকরা ৯০ জনই তা আদায় করছে না। এমনকি নরপশু স্বামীরা স্ত্রীর পক্ষ হ'তে যৌতুকের টাকা না দিতে পারায় স্ত্রীর উপর বিভিন্ন পৈশাচিক নির্যাতন ও হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করছে না।

(১৮) মদ-জুয়াঃ মদ-জুয়া হ'লো সমস্ত অপকর্মের হোতা। মদ পানের ফলে মানুষের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, ফলে সে যেকোন অপকর্ম করতে পারে। আর জুয়ার দ্বারা মানুষ সর্বহারা নিঃস্ব হয়ে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সম্পর্কে অহি প্রাপ্ত হয়ে সমাজ হ'তে মদ-জুয়া দূরীভূত করে আদর্শতম সমাজ বিনির্মাণ করেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই মদ-জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এ থেকে বিরত হও' (মায়েদা ৯০)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমাজ হ'তে মদ-জুয়া বিদূরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে পাশ্চাত্য লেখক Macdonald তাঁর Aspect of Islam গ্রন্থে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন, "The institution of abstinence from intoxicating Liquor is a very valuable feature of Islam and has had a beneficent influence in the diffusion of Muhammadan civilization.

'মাদক দ্রব্য বর্জনের ব্যবস্থা ইসলামের একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য এবং মুসলিম সভ্যতা বিস্তারে এর কল্যাণকর প্রভাব

রয়েছে'।[৮]

প্রচলিত সমাজে আবার সেই জাহেলিয়াতের কার্য (মদ-জুয়া) নতুনভাবে মহামারী আকারে আবির্ভূত হয়েছে। সমাজে মদ-জুয়া, গাঁজা, হেরোইন, ফেন্সিডিল প্রকাশ্যে খাচ্ছে আর জুয়ার কবলে হাযার হাযার পরিবার নিঃস্ব হচ্ছে।

(১৯) সুদঃ সুদ ধনী-দরিদ্রের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। সুদি কারবারে সমাজে ধনীরা দিন দিন সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। অন্যদিকে সুদের করাল গ্রাসে পড়ে দরিদ্রেরা আরো দারিদ্রতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ প্রেরিত অহি-র মাধ্যমে সুদকে হারাম ঘোষণা করে যাকাত ভিত্তিক একটি কল্যাণকামী আদর্শতম সমাজ নির্মাণ করেছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন' (বাক্বারাহ ২৭৫)।

কিন্তু প্রচলিত সমাজে আইয়ামে জাহেলিয়াতের ন্যায় সমাজের সর্বত্র সুদের ছয়লাব হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড (ব্যাংকিং ব্যবস্থা) পরিচালিত হচ্ছে সুদের উপর। সমাজের প্রায় ৮০% লোক প্রত্যক্ষভাবে ও অন্যরা পরোক্ষভাবে সুদের সাথে জড়িত। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরণের এনজিও সমাজের মধ্যে সুদি কারবার করে দরিদ্রদেরকে সুদের মধ্যে আবেষ্টিত করছে এবং সাথে সাথে মুসলমানদেরকে খ্রীষ্টান বানানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

(২০) ঘুষঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আইয়ামে জাহেলিয়াতের অভিশপ্ত ঘুষ প্রথার মুলোচ্ছেদ করে মানব কল্যাণকামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি যাকাত উত্তোলন কারীকেও ঘুষ নয় উপঢৌকন গ্রহণ করতেও কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। কিন্তু প্রচলিত সমাজে ঘুষের তাণ্ডবলীলা দেখে মনে হয় আইয়ামে জাহেলিয়ার বর্বরতাকেও হার মানাচ্ছে। ঘুষের মাধ্যমে অসত্যকে সত্য, সত্যকে অসত্য, বৈধকে অবৈধ, অবৈধকে বৈধ, উপযুক্তকে অনুপযুক্ত, অনুপযুক্তকে উপযুক্ত, দোষীকে নির্দোষ, নির্দোষকে দোষী করা হচ্ছে। ফলে সমাজে শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত হচ্ছে।

(২১) মীলাদঃ প্রচলিত সমাজে মীলাদ একটি অন্যতম সামাজিক ও ধর্মীয় বিড়ম্বনা। মীলাদের প্রসার এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কেউ নতুন কোন প্রতিষ্ঠান, বাড়ি-ঘর নির্মাণ করলে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মীলাদ না পড়লেই নয়। এক ইসলামের একটি অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজে মীলাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। খোলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণযুগে এমনকি তাবেঈ, তাবে তাবেঈ, ইমাম চতুষ্টয়ের যুগেও মীলাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই ধর্মে এমন নতুন জিনিষ আবিষ্কার করল, যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৯]

(২২) মীলাদুন্নবীঃ 'মীলাদুন্নবী' বিধর্মীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অন্যতম সামাজিক কুসংস্কার। প্রচলিত সমাজে বিধর্মীদের অনুকরণে মুসলমানগণ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম তারিখে মহা ধুমধাম ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর জন্ম দিবস উদযাপন করছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজে 'মীলাদুন্নবী' নামে তাঁর জন্মদিবস উদযাপন করার কোন দৃষ্টান্ত ছহীহ হাদীছ তো দূরের কথা কোন যঈফ হাদীছ এমনকি ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। খোলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণযুগ, ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ, মুহাদ্দেছীনে কেরাম ও ইমামদের যুগেও মীলাদুন্নবীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, প্রচলিত সমাজের দিকে তাকালে মনে হয় ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ, মুহাদ্দেছীন, মুজতাহেদীন ও ইমামদের চেয়েও বর্তমান সমাজের মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বেশী ভালবাসেন। কেননা তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মানে মীলাদুন্নবী উদযাপন করেননি। কিন্তু বর্তমান মুসলমানগণ ইহা করে থাকে।

(২৩) জন্ম-মৃত্যু দিবস উদযাপনঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে জন্ম-মৃত্যু দিবস উদযাপন করা হ'তো না। কিন্তু প্রচলিত সমাজে জন্ম-মৃত্যু দিবস বিধর্মীদের অনুকরণে উদযাপন করা হচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের দলভুক্ত'।[১০]

(২৪) কুলখানী-চেহলামঃ প্রচলিত সমাজে কেউ মারা গেলে বেজোড় তারিখে মৃত ব্যক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে কুলখানী ও চেহলাম করা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না।

(২৫) কদমবুচিঃ প্রচলিত সমাজে পিতা-মাতা, শ্বশুর-শ্বাশুরী, গণ্যমান্য মুরুব্বীদের সম্মানার্থে কদমবুচি করা হয়। এতে উন্নত ললাট তাঁদের কদমে ঝুকে পড়ে, যা শিরকের নামান্তর। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই।

(২৬) শবেবরাতঃ প্রচলিত সমাজে ১৫ই শা'বান দিবাগত রাতকে শবেবরাত (ভাগ্যরজনী) নাম দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন ইবাদতের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা

৮. *সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)ঃ তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খৃঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৫।*

৯. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০।*

১০. *আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭, সনদ হাসান।*

হচ্ছে এবং মনে করা হচ্ছে এ রাত্রে ভাগ্য, রূযী, হায়াত, মউত নির্ধারণ ও মৃত রূহের আগমন ইত্যাদি হয়ে থাকে। অথচ রাসূল (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে শবেবরাত নামে কোন মহিমান্বিত রাতের অস্তিত্ব ছিল না।

(২৭) পীর ও কবর পূজাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশ্বের বুকে আর্বিভূত হয়েছিলেন, মূর্তিপূজা, কবরপূজা অপনোদন করে তাওহীদের ঝান্ডা সুমন্নত করতে। তাই রাসূল (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজ ছিল মূর্তিপূজা, কবরপূজা মুক্ত। কিন্তু প্রচলিত সমাজে মানুষ মূর্তির বিকল্প পীর ও মাজার পূজা শুরু করছে এবং পীর ও মাজারে সেজদা দিচ্ছে ও সাহায্য প্রার্থনা করছে। যা অমার্জনীয় শিরক।

(২৮) জন্ম নিয়ন্ত্রণঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণ মুসলিম নিধনের অন্যতম গোপন হাতিয়ার। প্রচলিত সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যা সন্তানকে গোপন হত্যার নামান্তর। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জন্ম নিয়ন্ত্রণকে 'গোপন হত্যা' বলে উল্লেখ করেছেন।[১১]

শেষ কথাঃ পরিশেষে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ছিল কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দর্পণ স্বরূপ। পক্ষান্তরে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অবকাঠামো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে অনেকাংশে দূরে সরে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন সামাজিক বিশৃংখলা, অন্যায়-অবিচার, কলহ-বিবাদ, সন্ত্রাস, রাহাজানি সর্বোপরি অশান্তি বিরাজ করছে। ফলে পদে পদে মুসলিম সমাজ নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, বঞ্চিত ও অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে।

যদি আমরা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র বিধানাবলী সর্বাঙ্গীন জীবনের পথ ও পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করতাম তবে আবারও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজের ন্যায় কল্যাণকামী আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হ'ত। তাইতো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিষ ছেড়ে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে দু'টিকে আকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টি জিনিষ হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব তথা কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাত তথা হাদীছ'।[১২]

১১. *মাওলানা আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫ খৃঃ), পৃঃ ৩৫৬।*

১২. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, মিশকাত হা/১৮৬।*

ছাহাবা চরিত

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)

*-মুহাম্মাদ বিলাল হুসাইন**

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ ছিলেন ইসলামের এক মহান সেনাপতি এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিজেতা। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে বহু যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে ইসলামের বিরুদ্ধে আঘাত হানেন।[১] তিনি যেমন ওহোদ যুদ্ধে মুশরিক থাকাবস্থায় অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে বাহবা কুড়িয়েছিলেন, তেমনি মূতা-র যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহ্র তরবারী) উপাধি লাভ করেছিলেন।[২] মিসরের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ 'আবকারিয়াতু খালিদ' গ্রন্থে তাঁর সামরিক ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনা করে বলেন, 'সামরিক নেতৃত্বের সব গুণাবলীই খালিদ (রাঃ)-এর মধ্যে ছিল। বাহাদুরী, সাহসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা এবং শত্রুর উপর অকল্পনীয় আঘাত হানার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়'।[৩]

নাম ও জন্মঃ

নাম খালিদ, উপনাম আবূ সুলাইমান ও আবুল ওয়ালীদ। উপাধি সাইফুল্লাহ। মূতার যুদ্ধে তিনি অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য 'সাইফুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত হন।[৪]

তাঁর জন্ম তারিখ ঐতিহাসিকগণ সঠিকভাবে বলতে পারেননি। তবে এতটুকু জানা যায়, নবুঅতের ১৫ অথবা ১৬ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৪ অথবা ২৫ বছর।[৫] ইবনে আসাকির (রহঃ) বলেন, হযরত খালিদ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর সমবয়সী ছিলেন।

বংশ পরিচয়ঃ

পিতা ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা এবং মাতা লুবাবা আছ-ছুগরা। তাঁর বংশ তালিকা হচ্ছে- খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে

**. শেষ বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *P.M. Holt, The Cambridge History of Islam (Cambridge At the University press, 1970) p. 47.*

২. *ইবনুল ঈমাদ হাম্বলী, শাযারাতুয যাহাব, (মিসরঃ মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫০ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০।*

৩. *তালিবুল হাশেমী, বিশ্বনবীর সাহাবী, অনুবাদঃ আবদুল কাদের (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ; ১৯৯৪ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৮।*

৪. *The Cambridge History of Islam, p. 58.*

৫. *আ,ন,ম, মাঈন উদ্দীন সিরাজী, আসমাউর রিজাল (ঢাকাঃ আল-বারাকা লাইব্রেরী, ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড বাংলা বাজার), পৃঃ ৯৭।*

মাখযূম আল-কুরাশী আল-মাখযূমী।[৬]

ইসলাম গ্রহণঃ

হযরত খালিদ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের সময় সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তবে মক্কা বিজয়ের অল্পকিছু দিন পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি আছে।[৭]

হযরত আমর ইবনুল আছ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের জন্য হাবশা থেকে মদীনায় যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে অন্য আরেকটি দলের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তারাও ইসলাম গ্রহণের জন্য মদীনায় যাচ্ছিলেন। সেই দলের নেতা ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ। আমর ইবনুল আছ জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ দিকে? খালিদ জবাব দিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমার নিশ্চিত বিশ্বাস মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র নবী। চল যাই ইসলাম গ্রহণ করি।[৮]

তারা মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হ'লেন। প্রথমে খালিদ তারপর আমর ইবনুল আছ রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করেন।[৯] তখন খালিদ বলেছিলেন, হে রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে যত পাপ আমি করেছি তা ক্ষমার জন্য দো'আ করুন। রাসূল (ছাঃ) বলছিলেন, 'ইসলাম অতীতের সকল গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়'।[১০]

জিহাদে যোগদানঃ

ইসলাম গ্রহণের মাত্র দু'মাস পরেই হযরত খালিদ (রাঃ) সর্বপ্রথম মূতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন তিনজন- যায়েদ, জা'ফর ও আব্দুল্লাহ।[১১] তারা এ অসম যুদ্ধে নযীরবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করে একে একে শাহাদত বরণ করেন।[১২] পরপর তিনজন সেনাপতি শাহাদত বরণ করায় মুসলিম বাহিনীর মনোবল কিছুটা ভেঙ্গে পড়েছিল। অবশেষে খালিদ (রাঃ) মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব লাভ করেন। সাইফুম মিন সুয়ূফিল্লাহ (আল্লাহ্র অন্যতম এক তরবারী) সে পতাকা তুলে ধরে এবং তাঁর হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করেন।[১৩] এভাবে তিনি 'সাইফুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত হন।[১৪]

খালিদ বলেন, 'মূতার যদ্ধে আমার হাতে নয় খানা তরবারী ভেঙ্গে যায়। অবশেষে একখানি ইয়ামনী তরবারী অক্ষত থাকে'।[১৫]

হুনাইনের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং কমাণ্ডিং অফিসার ছিলেন।[১৬] এ যুদ্ধে তিনি দারুন সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং তাঁর শরীরের একাধিক স্থান আহত হয়। রাসূল (ছাঃ) তাঁকে দেখতে আসেন এবং আহত স্থান সমূহে ফুঁক দেন। যার ফলে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন।[১৭]

তায়েফ অভিযানে খালিদ (রাঃ) ছিলেন অগ্রগামী বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসার। হিজরী ৯ম সনে তাবুক অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন। ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জে রাসূল (ছাঃ)-এর সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।[১৮]

রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর আরব জাহানে আবার বিদ্রোহ-বিশৃংখলা দেখা দেয়। তাছাড়া বেশ কয়েকজন ভণ্ড নবীর উদ্ভব হয়। খালিদ বিন ওয়ালীদ ভণ্ড নবী তুলাইহার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।[১৯] রণাঙ্গনে তুমুল যুদ্ধ চলছে। প্রতিটি সংঘর্ষে তুলাইহার সঙ্গীরা পরাজয় বরণ করছে। একদিন তুলাইহা তার ঘনিষ্টজনদের কাছে জিজ্ঞেস করল, আমাদের এমন পরাজয় হচ্ছে কেন? তারা বলল, কারণ আমাদের প্রত্যেকেই চায় তার সঙ্গীটি তার আগে মারা যাক। অন্যদিকে আমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করছি, তাঁদের প্রত্যেকেই চায় তাঁর সঙ্গীর পূর্বে সে মৃত্যুবরণ করুক।[২০]

খালিদ তুলাইহার অনেক সঙ্গী-সাথীদেরকে হত্যা করেন এবং ৩০ জন সাথীকে বন্দী করে মদীনায় পাঠান। তিনি ভণ্ড নবী মুসাইলামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধেও অভিযান পরিচালনা করেন। ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামাতুল কায্যাবকে হত্যা করেন এবং তাঁর হাতেই বিজয় সাধিত হয়। شذرات الذهب গ্রন্থকার বলেন,

فيها غزوة اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب وفتحت اليمامة صلحًا على يد خالد بن الوليد-[২১]

---

৬. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ-ছাহাবাহ, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৮; মুহাম্মাদ বিন ত্বাহের মাক্বদেসী, কিতাবুল জাময়ে বাইনা রিজালিছ-ছাহীহাইন, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৪০৫ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮।

৭. মুহাম্মাদ আব্দুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪।

৮. আল-ইছাবা ফী তাময়ীযিছ-ছাহাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৮।

৯. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ আন-নববিইয়াহ (মিসরঃ মুসতফা আল-বাব আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহ ১৯৫৫) পৃঃ ৪৫৯।

১০. ঐ, পৃঃ ৪৫৯।

১১. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫।

১২. ঐ, পৃঃ ৬৫।

১৩. ঐ, পৃঃ ৬৫।

১৪. *Khalid b.al-walid on whom Muhammad had conferred the title of 'The Sword of Allah'. P.M. Holt, The Combridge History of Islam, P. 58.*

১৫. আল-ইছাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯।

১৬. *Thomas patriok Hughes, Dictionary of Islam (First published 1885, 54 Rani jhansi Road. New Delhi-110055), p. 263.*

১৭. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিছ ছাহাবাহ, (তেহরানঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ তা.বি) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৫।

১৮. আসমাউর রিজাল, পৃঃ ৯৮।

১৯. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬।

২০. মূলঃ মুহাম্মাদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ) অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মাদ যুবায়ের, হায়াতুছ ছাহাবা, ৩য় খণ্ড (ঢাকাঃ দারুল কিতাব, ৫০, বাংলা বাজার, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫), পৃঃ ৯৩।

২১. শাযারাতুয যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩।

ভণ্ড নবীদের ফিৎনা নির্মুল করার পর হযরত খালিদ (রাঃ) যাকাত দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ও মুরতাদদের (ইসলাম ত্যাগকারী) দিকে ধাবিত হন এবং তাদের উপর আঘাত হানেন। তাদের কিছু মারা যায়। কিছু বন্দী হয়। আর অবশিষ্টরা তওবা করে ইসলামে ফিরে আসে।[২২]

প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণঃ

আবুবকর (রাঃ) তাঁকে ইয়ারমুক যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় আবুবকর (রাঃ)-এর ইন্তিকাল হ'লে হযরত ওমর (রাঃ) খিলাফত লাভ করেন। হিজরী ১৩ সালে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে সাময়িকভাবে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করেন। আবার কারো মতে হিজরী ১৭ সনে তাঁকে অপসারণ করা হয়।

অপসারণের পর খলীফা ওমর (রাঃ) সর্বত্র ঘোষণা দেন, আমি খালিদকে আস্থাহীনতা, ক্রোধবশতঃ বা এ জাতীয় কোন কারণে অপসারণ করিনি। শুধুমাত্র এ কারণে পদচ্যুত করেছি যে, মুসলমানেরা জেনে নিক যে, খালিদের শক্তির ওপর ইসলামের বিজয়সমূহ নির্ভরশীল নয়। বরং ইসলামের বিজয় আল্লাহ্‌র মদদ ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।[২৩]

খালিদ অবনত মস্তকে খলীফার আদেশ মেনে নেন এবং সাধারণ সৈনিক বেশে বাকি যুদ্ধে শরীক থাকেন। কিন্তু তাঁকে কবি আশ'আছ ইবনে ক্বায়েসকে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন প্রদানের অভিযোগে হযরত ওমর (রাঃ) হিজরী ১৭ সালে সম্পূর্ণরূপে পদচ্যুত করেন।[২৪]

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনঃ

সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত হওয়ার কিছুদিন পর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে রাহা, হিরাত, আমদ এবং লারতার অঞ্চলসমূহের গভর্ণর নিয়োগ করেন।[২৫] কিছুদিন দায়িত্ব পালনের পর তিনি এ পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালিদ (রাঃ) মাত্র ১৪ বছর জীবিত ছিলেন। এ অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ১২৫ অপর বর্ণনায় ৩০০টি ছোট-বড় যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।[২৬]

হাদীছ শাস্ত্রে অবদানঃ

জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত খালিদ (রাঃ) জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত করেছেন। এ কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর সাহচর্যে থাকার সুযোগ তাঁর খুবই কম হয়েছে। তিনি নিজেই বলেন, জিহাদের ব্যস্ততা কুরআনের বিরাট একটি অংশ শিক্ষা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। তা সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুর পর মদীনার আলিম ও মুফতী ছাহাবীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তিনি মোট ১৮টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে দু'টি বুখারী ও মুসলিম এবং একটি বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[২৭]

তাঁর থেকে উল্লেখযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী হ'লেন- তাঁর খালাতো ভাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আলকামাহ (রাঃ), যুবাইর ইবনে নুফাইর (রাঃ), ক্বায়েস বিন আবী হাযেম প্রমুখ ছাহাবীগণ।[২৮]

ইন্তেকালঃ

৬৩৯ খ্রীঃ হিজরী ২১/২২ সালে ৬০ বছর বয়সে এ মহান বীরের মৃত্যু হয়। অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থকারের মতে, তিনি 'হিমছ' এ ইন্তিকাল করেন এবং 'হিমছ' থেকে এক মাইল দূরে এক গ্রামে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[২৯] কেউ বলেন, তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। কারণ খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর জানাযায় শরীক হন বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ আছে।[৩০]

উপসংহারঃ

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) ছিলেন ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। যার অনুপম তরবারীর ঝংকারে ইসলামের বহু বিজয় সাধিত হয়েছে। তিনি একজন আদর্শ সৈনিক ছিলেন। সেনাপতির পদ থেকে নেমে সাধারণ সৈন্য হয়ে যে যুদ্ধ করে গেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

পরিশেষে আবু যায়েদ শালবী'র উদ্ধৃতি পেশ করে তাঁর জীবন চরিতে ইতি টানছি। তিনি তাঁর 'খালিদ সাইফুল্লাহ' গ্রন্থে বলেছেন, 'আল্লাহপাক হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর উপর নিজের রহমত এবং বরকত নাযিল করেছেন। তিনি ইসলামের জন্য যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা এমন যা কখনো ভোলা যায় না। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হ'লো, আমরা যেন তার জীবনের ঘটনাবলী চিন্তা করি এবং নিজেদের মধ্যে হযরত খালিদের (রাঃ) গুণাবলীর সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করি। কেননা ইসলাম এবং মুসলমানদের জীবনে তাঁর গুণাবলীর অবলম্বনের মধ্যেই যথার্থ সার্থকতা নিহিত রয়েছে'।[৩১]

---

২২. শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, তারীখুল খোলাফা, পৃঃ ৭২।
২৩. ইবনুল আছীর, তারীখে কামিল, (মিসরঃ আল আজহারিয়া প্রেস, ১৮৮৪) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৮; বিশ্বনবীর সাহাবী, পৃঃ ২৫৭-২৫৮।
২৪. ঐ, পৃঃ ২৫৫।
২৫. আসহারে রাসূলের জীবন কথা, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭২।
২৬. ইবনুল আসীর তারীখে কামিল, পৃঃ ৪১৮।
২৭. আসমাউর রিজাল, পৃঃ ৯৮।
২৮. ঐ, পৃঃ ৯৯; কিতাবুল জামেয়ে বাইনা রিজালিছ ছহীহাইন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮।
২৯. ইবনু জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১৬।
৩০. উসদুল সাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৬।
৩১. বিশ্বনবীর সাহাবী, পৃঃ ২৬৫।

চিকিৎসা জগৎ

মাথা ব্যথা ॥ যা জানা প্রয়োজন

মাথা ব্যথা হয় না এমন লোক কমই আছে। ওয়াটার নামে একজন চিকিৎসকের মতে শতকরা ৭০ থেকে ৯০ জন মানুষ বছরে কম করে হ'লেও একবার কোন না কোন সময় মাথা ব্যথায় ভুগে থাকেন। রোগীরা এই মাথা ব্যথাকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেন। যেমন- মাথা ব্যথা, মাথা ধরা, মাথা ভারী, মাথার শূন্যতা ইত্যাদি। আবার মাথার আশপাশের অন্য কোন জায়গায় ব্যথা হ'লেও একই সঙ্গে মাথার ব্যথাও হ'তে পারে। যেমন- কান ব্যথা, সাইনাসের ব্যথা, চোখের ব্যথা, নাক, কান, গলা, চোখ, ঘাড়ের অসুখের কারণেও মাথা ব্যথা হ'তে পারে।

*** মাথা ব্যথার উৎপত্তিঃ** অনেক সময় মাথা ব্যথার রোগী চিকিৎসকের কাছে সরাসরি জানতে চান তাদের মাথায় কোন টিউমার হয়েছে কি-না। কেননা, অনেকে মনে করেন মাথা ব্যথা টিউমারের জন্য হয়ে থাকে। এছাড়াও মাথার আশপাশের কোন জায়গায় স্বাভাবিক কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটলেও মাথা ব্যথার সৃষ্টি হ'তে পারে।

৫ থেকে ১০/১২ বছরের মধ্যে বয়সের ছেলে-মেয়েদের মাথা ব্যথা সাধারণত এডিনয়েডের (নাকের পেছনের টনসিল বড় হ'লে) কারণে হয়ে থাকে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, মাথা ব্যথার জন্য মাথার আবরণ, ত্বক, মাথা ও ঘাড়ের মাসংপেশী, চোখ কান ও নাকের বিভিন্ন অংশবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এত গেল ব্রেইনের বাইরের কারণ। ব্রেইনের ব্যাপারগুলো যেমন- টিউমার, প্রদাহ, রক্তনালী কিংবা ব্রেইনের আবরণের কোন অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হ'লেও মাথা ব্যথা হয়ে থাকে। যে ধরনের মাথা ব্যথা খুবই সচরাচর হয়ে থাকে সেগুলো হ'লোঃ

*** টেনশন হেডেকঃ** যখন অনেক সময় ধরে মাথার বা ঘাড়ের মাংসপেশী সংকুচিত অবস্থায় থাকে তখন এ ধরনের হেডেক হয়ে থাকে।

*** ভাসকুলার হেডেকঃ** রক্তনালীর স্ফীতি বা প্রসারণের কারণে এ ধরনের মাথা ব্যথা হয়। যেমন- মাইগ্রেইন বা ক্লাস্টার হেডেক। বস্তুতঃ এই টেনশন ও ভাসকুলার হেডেক সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এবং এটি সব মাথা ব্যথার কারণের মধ্যে অন্যতম।

*** সাইনোসাইটিসঃ** বিভিন্ন ধরনের সাইনাসের প্রদাহের কারণে মাথার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের ব্যথা হয়ে থাকে। চোখের সমস্যার কারণে এ জাতীয় মাথা ব্যথা হয়।

*** ওকুলার হেডেকঃ** চোখের সমস্যার কারণে এ জাতীয় মাথা ব্যথা হয়ে থাকে।

তাছাড়া মাথার মধ্যে কিংবা মাথার বাইরে কোন টিউমার বা টিউমার জাতীয় রোগ কিংবা প্রদাহ হ'লেও মাথা ব্যথা হ'তে পারে। সুতরাং মাথা ব্যথা রোগীকে সঠিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে এবং সুন্দর করে পরীক্ষা করে মাথা ব্যথার কারণ উদঘাটন করতে হবে। মনে রাখতে হবে মাথা ব্যথা হ'লেই প্যারাসিটামল বড়ি খেয়ে ব্যথা সহসাই উপশম করা উচিত নয়।

হেলথ ট্রিপস

*** ধূমপায়ী সাবধান!ঃ** যারা প্রতিদিন ১৪টি সিগারেট পান করেন তাদের ফুসফুস ও রক্তের ইনফেকশন এবং ম্যানিনজাইটিসে আক্রান্ত হবার শঙ্কা অধূমপায়ীদের চেয়ে আড়াইগুণ বেশি। যারা প্রতিদিন ২৫টির মত সিগারেট পান করেন তাদের এই শঙ্কা বেড়ে যায় সাড়ে পাঁচগুণ। প্রিয় ধূমপায়ী তাই আবারও ভাবুন!

*** স্মৃতিশক্তি ধরে রাখতে চাইলেঃ** প্রাকৃতিক নিয়মেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়। তবে প্রবীণদের জন্য সুসংবাদ বয়ে এনেছেন জাপানী গবেষকরা। জাপানের জিফু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের গবেষকরা বলেছেন, চোয়াল নাড়িয়ে চাবালে মস্তিষ্কের হিপ্পোক্যাম্পাস অংশ উদ্দীপ্ত হয়, যা স্মৃতিশক্তি ধরে রাখতে সহায়তা করে।

*** জীবানুমুক্ত গলাঃ** সাধারণত দেখা যায় ঠাণ্ডায় গলা বসে গেলেই গার্গল করা হয়। এটি পুরোনো একটি পদ্ধতি হ'লেও এর কাজ চির নতুন। আধা চামচ লবণের সংগে ১০০ মিলিগ্রাম উষ্ণ গরম পানির গার্গলে গলায় বেড়ে উঠা ব্যাকটেরিয়ার মৃত্যু ঘটবে। এর জন্য দৈনিক চারবার গার্গল প্রয়োজন।

*** চুলকানি থেকে বাঁচতেঃ** অনেকের শরীরে মশার কামড়ও সহ্য হয় না। সাথে সাথে লাল হয়ে চামড়া ফুলে উঠে অসম্ভব চুলকায় এবং ঘা হয়ে যায়। এর জন্য টুথপেস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। কামড়ানোর জায়গায় টুপপেস্ট লেপে দিয়ে শুকিয়ে ফেলুন। ফুলে উঠবে না।

*** চোখে আঘাত লাগলেঃ** চোখের পাতা বন্ধ থাকলে ও সামান্য আঘাতে অস্বাভাবিক ক্ষতের কারণ হ'তে পারে। যেমনঃ কালো চোখ বা ব্ল্যাক আই চোখের পাতায় রক্তক্ষরণ হয়ে কালো হওয়া, অক্ষিঝিল্লি বা কনজাংটাইভারের নিচে রক্ত জমে যাওয়া, অক্ষিগোলক কেটে যাওয়া, চোখের ভেতর রক্তক্ষরণ, আইরিস ছিড়ে যাওয়া, ছানি পড়া, লেন্সের স্থানচ্যুতি, ভিট্রিয়াল রক্তক্ষরণ, অক্ষিপটে রক্তক্ষরণ, পীডকেন্দ্রে পানি জমে যাওয়া, অক্ষিপট বিচ্ছেদ, স্নায়ো নেত্রে আঘাত, অক্ষিগোলকের পানির চাপ বেড়ে যাওয়া এবং অক্ষি গোলকের হাড় ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি। বাহ্যিক সামান্য ক্ষতের চিহ্ন থাকলেও দেরি না করে চোখে পরিষ্কার পট্টি দিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া অত্যন্ত যরূরী। এ অবস্থায় যত দেরি হবে চোখের ক্ষতি তত বেশি হবে। কোন অবস্থাতেই চোখে পানি বা ওষুধ দেয়া উচিত নয়।

॥ সংকলিত ॥

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

সুবিচার

-মুহাম্মাদ মোস্তাফীযুর রহমান
**শামসুন বই ঘর, গাবতলী, বগুড়া।*

অনেকদিন আগের কথা। কোন এক রাজার ইচ্ছে হ'ল, মুসলিম দেশ ভ্রমণ করার। রাজা দিন নির্ধারণ করে ঘোড়ায় চড়ে বের হ'লেন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। বনের ভিতর দিয়ে পথ চলছেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল। গভীর বনে রাজা পথ হারিয়ে ফেললেন। রাতটাও ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা আশ্রয় খুঁজতে লাগলেন। অদূরে একটি বাড়ী দেখে তিনি সেখানে গিয়ে নিজের বিপদের কথা জানালেন। বাড়ীটি ছিল বন সরদারের। বনে যে সব লোক বাস করে তিনি ছিলেন তাদের সরদার। তিনি রাজাকে যত্ন করে ঘরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর খাবার সময় হ'লে খাবার দেওয়া হ'ল কয়েকটি খেজুর। রাজা খেতে গিয়ে দেখেন, সেগুলো সত্যিকারের খেজুর নয়। সোনা দিয়ে তৈরী খেজুর। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি সোনার খেজুর খাও? সরদার হেসে বললেন, না রাজা তা হবে কেন? আমরা আল্লাহ্‌র দেওয়া খেজুরই খাই। তবে আমাকে যে এগুলো খেতে দিলে? সরদার হেসে জবাব দিলেন, আমার ধারণা সোনার ফল যে দেশে হয়, হুযূর বোধ হয় সে দেশ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। নইলে সারা জীবন ধরে দুনিয়ায় এত রক্তপাত করে চলেছেন কেন? রাজা লজ্জিত হয়ে বললেন, সোনার খেজুর আমি চাইনা। তোমাদের দেশের নিয়ম-নীতি জানার আগ্রহ নিয়েই এসেছি।

খাওয়ার পর রাজা ও সরদার বৈঠক খানায় বসে আছেন। এমন সময় দু'জন লোক এসে হাযির হ'ল। একজন বলল, হুযূর আমি তার এক খণ্ড জমি ক্রয় করেছি। আজ ভোরে সেই জমি চাষ করতে গিয়ে এক হাঁড়ি মোহর পেয়েছি। হাঁড়িটি মাটির নীচে পুঁতা ছিল। কিন্তু জমি বিক্রেতা কিছুতেই মোহরগুলো নিতে রাযী হচ্ছে না। আমি কিনেছি জমির মাটি। মোহর তো কিনিনি। কাজেই মোহরের উপর আমার কোন দাবী নেই। লোভও নেই। অন্যজন বিনীতভাবে বলল, হুযূর! জমিতে যা কিছু ছিল সব তার কাছে বিক্রি করেছি। আমি কি করে এ টাকা নিয়ে অপরাধী হব?

সরদার কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। অতঃপর দু'জনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার একটি ছেলে এবং তোমার একটি মেয়ে আছে না? তারা বলল, জি হ্যাঁ, আছে। সরদার তখন বললেন, এ মামলার মীমাংসা হচ্ছে- তোমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিবে। আর সেই বিয়ের দেনমোহর হবে এই এক হাঁড়ি মোহর। এ মীমাংসায় তারা উভয়ই খুশি হয়ে ফিরে গেল।

সরদারের এই বিচার দেখে রাজা বললেন, আমার জীবনে এমন চমৎকার বিচার আর দেখিনি। সরদার রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ মামলার বিচার আপনি কিভাবে করতেন? রাজা বললেন, এ রকম মামলা আমাদের দেশে হ'তেই পারে না। নিজের কেনা জমিতে মোহর পেয়ে কেউ তা ফেরত দিতে আদৌ আসত না। সব মোহর নিজেই রেখে দিত।

সরদার বললেন, ভারী মজার দেশতো আপনাদের। কেউ এসে টাকা পাওয়ার খবর দিলে কি বিচার করতেন? রাজা বললেন, সে টাকা সরকার বাজেয়াফত করে ফেলত। সরদার বললেন, কি আশ্চর্য! এ তো দেখছি ডাকাতি। প্রজার টাকা নিজের করে নেওয়া। রাজা চুপ করে রইলেন।

অতঃপর সরদার বললেন, সূর্য আপনাদের দেশে আলো দেয় কি? আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় কি? রাজা বললেন, হ্যাঁ, সূর্য আলো দেয়, বৃষ্টিও বর্ষিত হয়। সরদার বললেন, তা'হলে নিশ্চয়ই আপনাদের দেশে অনেক নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির জীব-জানোয়ার আছে, তাইনা? রাজা বললেন, জীব-জানোয়ার সব দেশেই আছে। যেমন আছে আপনাদের দেশে, তেমন আছে আমাদের দেশেও। সরদার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হ্যাঁ, তাই বলুন। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি সূর্য কেন আলো দেয় এবং বৃষ্টিই বা কেন বর্ষিত হয়। ঐ সব নিরীহ জীব-জানোয়ারগুলোর জন্যই আপনারা আল্লাহ্‌র দেওয়া রোদ-বৃষ্টি ভোগ করছেন। তা নাহ'লে এমন যালেম সরকারের দেশে আল্লাহ রোদ-বৃষ্টি দিতেন না। রাজা মাথা নীচু করে ভাবতে লাগলেন, যাদের আমরা অসৎ ও অশিক্ষিত বলছি, তারাই সত্যিকারের সৎ ও সুবিচারক।

পপুলার নার্সিং হোম

(প্রস্তাবিত বে-সরকারী হাসপাতাল)

সার্জারী ০ মেডিসিন ০ গাইনী ও অবস ০ নাক, কান ও গলা ০ অর্থপেডিক্স ০ চক্ষু রুগীর চিকিৎসা ও অপারেশন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা করা হয়।

হাসপাতাল ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে ও চিকিৎসা করা হয়

কাদিরগঞ্জ গ্রেটার রোড, কদমতলা, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৭১৪৮৫

স্বল্প খরচে সর্বোত্তম আধুনিক সেবাই আমাদের লক্ষ্য

কবিতা

জিহাদের অনুমতি

-মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী
পোঃ+সাং- ভেলাবাড়ী (শাশমারা)
থানা- আদিতমারী, লালমণিরহাট।

বিদায় দাও মা বিদায় দাওগো
জিহাদে যাওয়ার তরে,
নইলে মাগো জাহান্নাম থেকে
বাঁচবো কেমন করে?
এখন যদি আদর করে
রাখ তুমি ঘরে
জাহান্নামে জ্বলবো সেদিন
থাকবো চিরতরে।
অন্যায়-অনাচার কত কিছু দেখছি বারে বারে
আমরা মুসলিম যুবক হয়ে থাকবো না তাই ঘরে।
তোমার সন্তান গাযী হয়ে
আসবে আবার ফিরে
আদর তখন কইরো মাগো
তোমার অন্তর ভরে।
তোমার ছেলে শহীদ হ'লে
শান্তি পাবে পরে
শোক-দুঃখ ভুলে যেও
জান্নাতের খাতিরে।

***

অহি-র বিধান

-শহীদুল্লাহ চাঁদপুরী
[illegible], চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

আয় ছুটে আয় যুবক দল
আল-কুরআনের পথে
দু'হাত তুলে চাইব নাজাত
আল্লাহ তা'আলার কাছে।
সকল বিধান বাতিল করে
চলব মোরা অহি-র পথে
এই বিধানে অটল মোরা
মরণ যদিও হয়গো তাতে।
আল্লাহ তুমি আরশে থেকে
মদদ কর দিনে-রাতে।
তোমার বিধান সব জায়গাতে
পৌঁছে দিব সকাল-সাঁঝে
অহি-র বিধান কায়েম করে
মরতে চাইগো সবাই মিলে।
আত-তাহরীক পত্রিকাটা
অহি-র বিধানে ভরা
অন্য সব পত্রিকা পড়ে
মানুষ হচ্ছে দিশেহারা।
অহি-র বিধান ভুলে গিয়ে
পথহারা সব পথিক
সব পত্রিকার শীর্ষে স্থান
মোদের **আত-তাহরীক**।

***

সোনামণি

-আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষীপুর
চারঘাট, রাজশাহী।

সোনামণি সোনাদের
ভাল মোরা বাসবো
হাসি ভরা মুখ দেখে
প্রাণ খুলে হাসবো।
ছোট্ট চোখের চাহনিতে
কি যে যাদু মাখারে
ভবিষ্যতের অন্ধকারে
উজ্জ্বল আলো আঁকারে।
পাখীর মত মুখের বুলি
বড় মধুর মিষ্টি
এ যেন গো বিধাতার
অপূর্ব এক সৃষ্টি।
সোনামণি মোদের যখন
বড় হয়ে লড়বে
শিরক-বিদ'আত ধ্বংস করে
তাওহীদী দেশ গড়বে।
ওরাই তরুণ ওরাই যুবক
ভবিষ্যতের বীর মুজাহিদ
তাগূতী রাজ ধ্বংস করতে
আল্লার পথে হবে শহীদ।
সকল যুলম অত্যাচারের
অবসানও করবে
ধর্মের পথে শহীদ হয়ে
বেহেশতী পথ ধরবে।

***

ইন্দ্রজাল উপাখ্যান

-মুহাম্মাদ জাকির হোসাইন
ঘোনা, সাতক্ষীরা।

হে মুসলিম নওজোয়ান ঘুম হ'তে জাগো
অত্যাচারীর পাষাণ বুকে কামান দাগো।
চেয়ে দেখ চারিদিকে মযলূমের আর্তচিৎকারে
বসুমতি আজ বিষিয়ে উঠেছে দেখিবে কে তারে?
নানা অসৎ হাওয়ায় পৃথিবীর আকাশ আজ ভারী
পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ অতিষ্ঠ সবাই তারী।

অর্থ-বিত্ত-ধনের বৈষম্য আর ব্যবধানে,
পৃথক পৃথক গোত্র গড়েছে পৃথিবীর সবখানে।
যেথায় একটু ঠাঁই ছিল অনাথ ও আর্তের,
সেখানেও আজ ঢুকে পড়েছে পলিটিক্স মর্ত্যের।
মানুষ নামের কলঙ্ক সব চেহারা বিশ্রী
দেখলে পরে মনে হবে না তাদের সালাম করি।
জগত জুড়ে চলছে আজি অসত্যের প্রহসন
হাবুডুবু খেয়ে যেখানে আমরা করছি অনশন।
যুলুমবাজ মানুষগুলোর কে রুখবে বলো,
শেষ সম্বল তাও গিয়েছে ঈমান যাদের ছিল।
কেউ কেউ ভাই নামায পড়ে মানে শরী'আত
তার ভিতরেও ঢুকে গিয়েছে বিধ্বংসী বিদ'আত।
আজকেরে ভাই স্বার্থ ছাড়া কেউ ফেলেনা পা
যেথায় যাবেন সেথায় খাবেন স্বার্থপরের ঘা।
এই ভাবে কি চলতে পারে জগত সংসার?
চলছে যেটুক ঠেলার জোরে হয়ে যাচ্ছে পার।

***

প্রয়োজন

-শরীফুল ইসলাম মুহাম্মাদী
জাইগীরগ্রাম, কানসাট,
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

'আল-ইসলাম' এখন ফির্কার দাবদাহে ক্রমশঃ হচ্ছে অঙ্গার
সোনালী মিষ্টি আলো নিবু নিবু প্রায়
নামছে তমসা, রজনীর বিভৎস রূপ,
একই অঙ্গের পঞ্চ অংশের সুন্দর মাংসপিণ্ড
হচ্ছে নিশাচর রাক্ষসির মুখের গ্রাস।
অতীতে ইসলামের রূপ-রস-যশ-মান দেখেছে পৃথিবী
তাই আজ ঘন ঘন উঠছে নাভিশ্বাস
শুনছে প্রহর ইসরাফীলের ধ্বংসের ফুৎকার।
নতুন হয়ে দেখা দিয়েছে প্রয়োজন
ইজতেহাদে নিমগ্ন মুজতাহিদ যারা
ছহীহ, যঈফ, মুরসাল, হাসান, ইত্যাদি বিচারের রাখেন যারা জ্ঞান
সবার সমন্বয়ে দেশব্যাপী অথবা বিশ্বব্যাপী সেমিনার করার।
ছহীহ হাদীছের আলোকে একমত হয়ে
তাক্বলীদী জড়তা কাটিয়ে যেতে হবে সোজা মুহাম্মাদী পথে
একই ইবাদতে ভিন্নতা থাকবে না
আল্লাহ আহাদ।
নবীও এক
সিদ্ধান্ত হবে কেন দুই?

***

মুক্তিকামী

-মুহাম্মাদ আব্দুল মবীন সরকার
নিউমার্কেট, ষষ্টিতলা, রাজশাহী।

আপাদ মস্তক ঘর্মাক্ত যদিও হয়
পদতল রক্তিম যদিও হয়
দুর্গম পর্বতশৃঙ্গ মোরা
নির্ভয়ে করব জয়।
লোভী পিশাচগণ যদি করে জীবন দুর্বিষহ,
ভয় করবনা মোরা
গেয়ে যাব আল্লাহ-রাসূলের জয়গান অহরহ।
হই যদি মোরা ভীত শঙ্কিত অনর্গল,
রক্ত চোষারা রক্ত চুষবে
কৃষ্ণ বর্ণ মুখোশ স্ফীত হবে
ভরবে বিশ্ব ইল্‌ম নিঃশে, ঘুরবে জাহেলের দল।
ওহে! ও ভাই! কর কি ভয়?
পূর্বের পাতা মেলে দেখ সৈনিক দুর্জয়
সপে দাও মনপ্রাণ হয়ে রবে অক্ষয়।
চেয়ে দেখ ঐশী বাণীতে
শহীদ-গাযী হয়ে আছে সেথা
ভরপুর শান্তি ও শান্তি বাণীতে।
তুমি চাও কি তাদের মত গন্তব্যস্থান?
তবে ধর, ভাই ধর!
ধর শুধু ইসলামের-ই জয়গান।

***

তাহরীক তোমার আগমনে আমরা ধন্য
তুমি হও সকলের চলার একমাত্র সাথী।

জাকিয়া ক্লিনিক

ডাঃ মাহবুবুর রহমান
(সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) পল্লী চিকিৎসক
বটতলী বাজার, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

ঢাকা মেটাল প্রোডাক্টস

এখানে থাই এ্যালুমিনিয়ামের দরজা, জানালা, ফল্‌স সিলিং, এ্যালুমিনিয়াম ফেব্রিকেশন ও ষ্টিল আসবাবপত্র তৈরী ও সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা মেটাল প্রোডাক্টস
কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড, রাজশাহী
ফোন ঃ ৭৭১৫৫৭
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-৭২১-৭৭৩০৬০

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

❐ **নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ** যিয়াউল ইসলাম, শিশির, শাওন, শাহাদত হোসাইন, মুস্তফা কামাল, আনোয়ার হোসাইন, মিনারুল ইসলাম, আব্দুল ওয়াদূদ, দেলোয়ার হোসাইন, সোহাগ, ত্বারেক, শিমুল ও সুমন।

❐ **মিঞাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** পলাশ, পরাগ, সোহেল, মিথুন, মিলন, আব্দুল্লাহ, শামসুন্নাহার, ফারহানা খাতুন, আনোয়ারা, রোকশানা, লিলি, বেলি, মিতা ও বিথী।

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তর

১. আরশে সমাসীন (ত্বা-হা ৫)।

২. আটজন ফেরেশতা (হাক্কা ১৭)।

৩. ইহ্সানকারীদের (প্রতিদানের আশা ব্যতীত পরের উপকারী ব্যক্তিদের) (আলে ইমরান ১৩৪)।

৪. সিজদা করার নির্দেশ দিবেন (ক্বালাম ৪২)।

৫. মাটির তৈরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট 'অহি' আসত (আর আমাদের নিকট আসে না) (কাহাফ ১১০)।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন)

১. পবিত্র কুরআনের আম্মাপারায় সর্বমোট কয়টি সূরা আছে?

২. 'মু'আউওয়াযাতান' পবিত্র কুরআনের কোন দু'টি সূরাকে বলা হয় এবং এ শব্দটির অর্থ কি?

৩. কুরআনের কোন্ তিনটি সূরায় ৩টি করে সর্বমোট ৯টি আয়াত আছে এবং সূরাগুলোর ক্রমিক নং কত?

৪. কুরআনের কোন্ দু'টি সূরায় ৪টি করে আয়াত আছে? সূরা দু'টির নাম কি?

৫. আম্মাপারার সবচেয়ে বেশী আয়াত বিশিষ্ট তিনটি সূরার নাম কি এবং আয়াত সংখ্যা কত?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. অতি ক্ষুদ্র বীজে বৃহৎ বৃক্ষ জন্মে এরূপ দু'টি বৃক্ষের নাম কি?

২. মাত্র একটি করে বিচি থাকে এরূপ ৫টি ফলের নাম কি?

৩. প্রচুর পরিমানে ভিটামিন 'সি' থাকে এরূপ ৫টি ফলের নাম কি?

৪. অস্ত্র ছাড়া খাওয়া যায় না, এমন একটি ফলের নাম কি?

৫. কোন্ গাছের পাতা থেকে চারা গজায়?

যাদু নয় বিজ্ঞান

ক্যালেন্ডার না দেখে বার বের করার অভিনব কৌশলঃ

(শুধু ২০০০ সালের জন্য প্রযোজ্য)

১. প্রথমে ইংরেজী ১২ মাসের নিম্নে প্রদত্ত মান মুখস্থ করতে হবেঃ

(ক) জানুয়ারী + এপ্রিল + জুলাই-এর প্রত্যেকের মান =৭
(খ) ফেব্রুয়ারী + আগষ্ট-এর প্রত্যেকটির মান = ৩
(গ) মার্চ + নভেম্বর -এর " " = ৪
(ঘ) সেপ্টেম্বর + ডিসেম্বর -এর " " = ৬
(ঙ) অক্টোবর, মে ও জুন -এর মান যথাক্রমে-১, ২ ও ৫।

২. সূত্রঃ (মান + তারিখ $\div$ ৭)।

এক্ষণে প্রশ্নঃ এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ কি বার?

উত্তরঃ আমরা জানি, এপ্রিল মাসের মান=৭।

অতএব, (৭+২০ $\div$ ৭)= ভাগফল ৩ ও ভাগশেষ ৬। ভাগফলের কোন প্রয়োজন নেই। শনিবারকে ১ ধরে ভাগশেষ ৬ অর্থাৎ ষষ্ঠতম বারটিই হবে এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ। সুতরাং এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ হবে বৃহস্পতিবার।

৩. উল্লেখিত নিয়মে যোগ করার পর যোগফল ৭ অথবা তার বেশী হ'লে ৭ দিয়ে ভাগ করবে এবং ৭ এর কম হ'লে ভাগ করার প্রয়োজন নাই। যোগফল ১ হ'লে শনিবার, ২ হ'লে রবিবার, ৩ হ'লে সোমবার, ৪ হ'লে মঙ্গলবার, ৫ হ'লে বুধবার ও ৬ হ'লে বৃহস্পতিবার। এভাবে ৩৬৫ দিনের বার নির্ণয় করা সম্ভব।

আহ্বান

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
নাগোরঘোপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
মণিরামপুর, যশোর।

এসো সবে আলোর পথে
তরুণ-কিশোর দল
সত্য-ন্যায়ের পথে এসো
বুকেতে অসীম বল।
নতুন পৃথিবী গড়তে চলো
জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ি,
আঁধার ছেড়ে এসো আলোর পানে
ফুলের মত জীবন গড়ি।

কুরআন-হাদীছের মশাল জ্বেলে
ঘুচাও আঁধার যত
নবীন যাত্রীরা এগিয়ে চলো
বীর সেনানীর মত।
তোমাদের ও পথে কভু যদি
আঁধার আসে নেমে
ঈমানী বলে এগিয়ে যাবে
কখনও রবেনা থেমে।
নতুন দিনের আমরাই সাধক
সত্য পথের পথিক।
আল্লাহ মোদের সহায় সদা
এসো হে নির্ভিক সৈনিক।

***

ইচ্ছা

-মুহাম্মাদ জুয়েল (২য় শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা
রাজশাহী।

আমার বড় ইচ্ছে করে
কুরআন-হাদীছ জানতে
সারা জীবন জ্ঞান অর্জন করে
মহাজ্ঞানী হ'তে।
নবীর আদর্শে গড়ব জীবন
সোনামণি করে
দুঃখী জনের দুঃখ ঘুচাব
অন্ন-খাদ্য সাহায্য করে।
সত্য কথা বলব আমি
মিথ্যা পরিহার করে
জ্বালিয়ে দিব জ্ঞানের আলো
সবার ঘরে ঘরে।
মাতা-পিতা যা বলবেন
মানব খুশী মনে
সকাল বিকাল পড়ব তাহরীক
সহপাঠীদের সনে॥

***

শাখা গঠনঃ

(১৫২) বর্ষাপাড়া মহিলা মাদরাসা শাখা, গোপালগঞ্জ।
প্রধান উপদেষ্টাঃ সাবেরা সুলতানা
উপদেষ্টাঃ মাহমূদা সুলতানা
পরিচালিকাঃ রেবেকা সুলতানা (রাবেয়া)
সহকারী পরিচালিকাঃ রুবিয়া খানম
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ রাবেয়া সুলতানা
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ রহীমা খানম
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ আসমা খানম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ রেহানা খানম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ সাবিনা খানম।

(১৫৩) মাটিলা পাড়া (বালক) শাখা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সলেমান ইসলাম
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ইবরাহীম আলী
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আব্দুল মতিন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ সোহেল
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আব্দুল কাদের
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ আসাদুল্লাহ।

(১৫৪) মাটিলা পাড়া (বালিকা) শাখা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সুলতানুল ইসলাম
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আরিফুর রহমান
পরিচালিকাঃ মাকছূদা খাতুন
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ রুনা
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ সুখতারা
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ সারমিন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ সেলিয়ারা।

(১৫৫) দক্ষিণ নয়ানগুকা (বালক) শাখা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম (শিক্ষক)
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল করীম
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আরিফুর রহমান
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ ইয়াসিন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ ইউসুফ
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আব্দুল হাকিম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুস্তাকীম।

(১৫৬) দক্ষিণ নয়ানগুকা (বালিকা) শাখা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল করীম
পরিচালিকাঃ মোসাম্মাৎ জলি খাতুন
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ সাবানী
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ রীমা
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মমতাজ
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ শিরিন।

(১৫৭) চাটাইডুবী (বালক) শাখা, ইসলামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সোহেল আখতার
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম (দরি)

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আওয়াল

শাখা কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ যিয়াউর রহমান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ সুমন কবীর
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ তরিকুল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ রুবেল।

(১৫৮) বার রশিয়া (বালক) শাখা, ইসলামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ছাদিকুল ইসলাম
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মোযাম্মেল হক

শাখা কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আব্দুর রহমান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ কবীর
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ যিয়াউল
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ ফরীদ।

(১৫৯) বাররশিয়া (বালিকা) শাখা, ইসলামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ছাদিকুল ইসলাম
পরিচালিকাঃ উম্মে কুলছুম

শাখা কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ ফাতিমা
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মাহমূদা
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ লাইলী
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ জরিনা।

(১৬০) বাসেদ মণ্ডলের টোলা (বালক) শাখা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ নৈমুদ্দীন
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মাতিন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ শামসুল হুদা

শাখা কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ খাইরুল
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আব্দুল কাফী
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ হাবীবুল্লাহ
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ আব্দুস সুবহান।

(১৬১) গুলজার হাজীর টোলা (বালক) শাখা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ দুরুল হুদা
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সোহরাব আলী
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সোহেল রানা

শাখা কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ শামসুল হুদা
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ নূরুল
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ রবিউল
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ রুহুল আমীন।

(১৬২) গুলজার হাজীর টোলা (বালিকা) শাখা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

প্রধান উপদেষ্টাঃ জাহানারা বেগম
উপদেষ্টাঃ রুমালী খাতুন
পরিচালিকাঃ খালেদা খাতুন

শাখা কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ খাদীজা
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ আয়েশা
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ রহীমা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ নূর জাহান।

(১৬৩) সুনগর মাদরাসা (বালক) শাখা, নীলফামারী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ খায়রুল আযাদ

শাখা কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মাহফুযার রহমান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আল-আমীন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ বদরুল আলম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ সাইফুল ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ মশীউর রহমান।

(১৬৪) মৌজা শৌলমারী মাদরাসা (বালক) শাখা (১), নীলফামারী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ খায়রুল আযাদ

শাখা কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ হাসানুর রহমান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ ফরীদুল ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আব্দুল ওয়াহ্হাব
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুনাব্বার হোসাইন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ আশরাফ আলী।

(১৬৫) মৌজা শৌলমারী মাদরাসা (বালক) শাখা (২), নীলফামারী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (১)

শাখা কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ রাকীবুযযামান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ সাইফুল ইসলাম (২)
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ এমদাদুল হক
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ আতীকুল ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ আনছারুল হক।

(১৬৬) মৌজা শৌলমারী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (বালক) শাখা, নীলফামারী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সাজেদুল ইসলাম

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃমুফাযযাল হোসাইন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ রকীবুদ্দীন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ শাহাজাদ হোসাইন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ জাহাঙ্গীর আলম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ হাবীবুর রহমান।

(১৬৭) কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ (বালক) শাখা, নীলফামারী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
পরিচালকঃ রামাযান আলী

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আলাউদ্দীন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ হাবীবুর রহমান
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ ছাদেকুল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ কাহাবুদ্দীন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ আবু তালিব।

দো'আ কামনা

ছোট্ট বন্ধুরা! বগুড়া যেলার গাবতলী থানাধীন কানাইহাটা গ্রামের ছোট্ট সোনামণি **'তুহিন'** দীর্ঘদিন থেকে মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত। সে এখন বগুড়া মুহাম্মাদ আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না। বরং ক্রমশঃ অবনতির দিকে এগুচ্ছে। ২০০০ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মেধাবী ছাত্র তুহিন তোমাদের সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী। আমরা সকলে আমাদের প্রিয় বন্ধুটির জন্য দো'আ করি। আল্লাহ যেন তাকে দ্রুত আরোগ্য দান করেন-আমীন!!

পরিচালক
সোনামণি

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

প্রতিদিন একশ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ অপচয়

পিডিবি থেকে ডেসার সাব-স্টেশনগুলোতে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের সময় প্রতিদিন ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের অপচয় হচ্ছে। এই বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে, না সিস্টেম লসের আওতায় পড়ছে কেউ জানে না। পিডিবি এবং ডেসা পরস্পরকে বিষয়টির জন্য দায়ী করে দোষারোপ করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। কেউ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে না। মাঝখান থেকে প্রতিদিন উধাও হচ্ছে কোটি কোটি টাকা মূল্যের বিদ্যুৎ। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ডেসা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য মোট ১৮টি সাব-স্টেশন রয়েছে। এই স্টেশনগুলো ন্যাশনাল গ্রিড লাইন থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে তা ছোট ছোট সাব-স্টেশন এবং ফিডারের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকাসহ ডেসা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, ৩রা মার্চ শুক্রবার পিডিবি জেনারেশন এণ্ড (উৎপাদন প্রান্ত)-এ ডেসাকে ১০১১ মেগাওয়াট, ৪ঠা মার্চ শনিবার ১০৮৭ মেগাওয়াট এবং ৫ই মার্চ রোববার ১০২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিয়েছে। অথা একই তারিখগুলোতে ডেসা সাব-স্টেশন এণ্ড (উপকেন্দ্র প্রান্ত)-এ যথাক্রমে ৮৯০ মেগাওয়াট, ৯৫৭ মেগাওয়া এবং ৯০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেয়েছে। অর্থাৎ এই তিনদিনে ন্যাশনাল গ্রিড লাইন থেকে ডেসার সাব-স্টেশনে বিদ্যুৎ সঞ্চালনকালে ১২১ মেগাওয়াট, ১৩০ মেগাওয়া এবং ১২৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বেমা'লূম লাপাত্তা হয়ে গেছে এভাবেই প্রতিদিন লাপাত্তা হচ্ছে গড়ে ১০০ মেগাওয়া বিদ্যুৎ।

বাংলাদেশ সিটিবিটি স্বাক্ষর করায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিনন্দন

যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক ভিত্তিক পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (সিটিবিটি) অনুমোদন করায় বাংলাদেশকে স্বাগত জানিয়েছে। বাংলাদেশ এটি অনুমোদনের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে প্রথম পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ মিশনে যোগদান করল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৭ই মার্চ এক নির্বাহী আদেশ বলে সিটিবিটি অনুমোদন করায় হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা এর প্রশংসা করে বলেন, আমরা বাংলাদেশ সফরের আগেই এটা করায় খুব ভাল হয়েছে।

বিশ্বের সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ বাংলাদেশ

-বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি

বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংক পরিচালক ফ্রেডারিক টি টেম্পল বলেছেন, বিশ্বে সবচেয়ে মারাত্মক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তিনি বলেন, ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল, বিজিনেস ইন্টারন্যাশনাল, পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেস এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম-এর মত বিভিন্ন সংস্থার জরিপে বাংলাদেশের দুর্নীতিগ্রস্ততার ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের মতে, বাংলাদেশ উচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর কাতারে পড়েছে। গত ১২ই মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত পার্ক (PARC) ওয়ার্কশপে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি তার সূচনা বক্তব্যে এ তথ্য দেন। মিঃ টেম্পল বলেন, দুর্নীতির কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অনেক দোগান্তি পোহাতে হয়। তিনি বলেন, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে জনগণের সুযোগ-সুবিধা কমে এসেছে। সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ওষুধপত্র চুরি হচ্ছে, পাঠ্যবই চুরি হচ্ছে এবং সেগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিক্রি করা হচ্ছে। চিকিৎসক ও শিক্ষকরা তাদের কর্মস্থলে থাকেন না। অথচ তারা তাদের সার্ভিস বিক্রি করেন অন্যত্র নিয়োজিত থেকে। দুর্নীতির কারণে জনসম্পদ চলে যাচ্ছে ধনিক গোষ্ঠীর কাছে। তিনি বলেন, অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও দুর্নীতি নতুন কোন বিষয় নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের নেতারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রায়ই কথা বলছেন, নিন্দা করছেন। কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা কোন সরকারই গ্রহণ করেনি। এমনকি ৯০-এর দশকে দু'টি গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। বরং দুর্নীতি আরো বেড়েছে।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অস্বচ্ছতা বিরাজ করছে। তাদের আয়ের উৎস সম্পর্কে জবাবদিহিতা থাকা উচিৎ। বাংলাদেশে দুর্নীতি সর্বব্যাপী রূপ ধারণ করেছে। সমস্যা শুধু কর ও শুল্ক প্রশাসনেই নয়, সমস্যা রয়েছে ব্যাংকের দেনা পরিশোধে, বিদ্যুৎ, বন্দর, টেলিযোগাযোগ, মানব উন্নয়ন সার্ভিসেস- সর্বত্র চলছে চুরি ও ঘুষের রাহাজানি এবং সর্বত্র দুর্বল প্রশাসন। অথচ প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নেই।

বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হ'লে জনপ্রশাসন সংস্কারে সরকারী খাতের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাড়াতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর এবং তাদের নির্বাচনের জন্য অর্থায়নের দিকটির সংস্কার করতে হবে। তাদের আয় ও ব্যয়ের উৎস স্বচ্ছ হ'তে হবে এবং সরকারী খাতগুলোর ক্ষেত্রে সীমিত করে যা প্রয়োজন তাই রাখতে হবে। মিঃ টেম্পল দুর্নীতি রোধে আরো কয়েকটি নীতির কথা উল্লখ করে বলেন, আমলাদের ক্ষমতা হ্রাস করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে জনগণের যোগাযোগের পথ সুগম করতে হবে এবং জনগণ যাতে দুর্নীতির খবর কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে ৯১১৮৪৪৮ নম্বরে ফোন করুন

এখন থেকে '৯১১৮৪৪৮' নম্বরে ফোন করে আবহাওয়ার প্রতিদিনের পূর্বাভাস জানা যাবে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মুহাম্মাদ এরশাদ হোসাইন জানান, আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে ২৪ ঘন্টার জন্য 'অটো আনসারিং সিস্টেম' চালু করা হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস ক্যাসেটে রেকর্ড করা থাকবে, যা ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠবে। বর্তমানে সকাল ও বিকালে ২ বার পূর্বাভাস রেকর্ড করা হবে। দুর্যোগজনিত আবহাওয়ার সময় একাধিকবার সর্বশেষ তথ্যসহ পূর্বাভাস রেকর্ড করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সন্ত্রাসীদের নগরী ফেনী

সন্ত্রাসকবলিত ফেনীতে একজন জীবিত মানুষের যেমন জীবনের নিরাপত্তা নেই, তেমনি লাশেরও নেই কোন সুরক্ষিত ব্যবস্থা। এখানে অবৈধ অস্ত্রধারী ও চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীদের এতই দৌরাত্ম্য যে, সন্ত্রাসীদের চাঁদার দাবী পূরণ না করে লাশ কবরে নামাতে দেয়া হয় না। অপরদিকে নবজাতক শিশু ভূমিষ্ঠ হ'লে চাঁদা না দিয়ে তার নাম রাখা যায় না। শুধু তাই নয়, বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথিদের আগেই সন্ত্রাসীদের উদর ভর্তি করে খাবার খাওয়াতে হয় এবং দাবীকৃত চাঁদার টাকা হাতে তুলে দিয়ে বর-কনেকে বাসরঘরে যেতে দেয়া হয়।

টমেটোর কেজি ২৫ পয়সা!

মওসুমের শুরুতে ৮০ টাকা কেজি দরের টমেটো এখন নরসিংদীতে মাত্র ২৫ পয়সা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। তাও ক্রেতার সংখ্যা কম। টমেটো নিয়ে উৎপাদক চাষী ও বিক্রেতারাই বিপাকে পড়েননি, ক্রেতারাও মাঝে মধ্যে বিপাকে পড়ছেন। প্রায় ১ মণ ওজনের ১ ঝুড়ি পাকা টমেটো মাত্র ১০ টাকায় পেয়ে বিপাকে পড়ে অনিন্দ্য সাহা নামে এক নাস্তা ব্যবসায়ী। নরসিংদী শহরের ব্রাহ্মণদী নয়াবাজারের নাস্তা ব্যবসায়ী অনিন্দ্য। তার দোকানের সালাদ তৈরীর জন্য একই বাজারে টমেটো কিনতে গিয়ে হেয়ালীবশত বিক্রেতাকে ১ ঝুড়ি টমেটোর দাম জিজ্ঞেস করলে বিক্রেতা ৫০ টাকা দাম হাঁকে। অনিন্দ্য ১০ টাকা বলে কেটে পড়তে চাইলেও বিক্রেতা তাকে ছাড়েনি। ১০ টাকায়ই এক ঝুড়ি টমেটো দিয়ে বিক্রেতা ঝামেলা মুক্ত হ'তে চায়। কিন্তু ১০ টাকায় ১ ঝুড়ি টমেটো পেয়ে

অনিন্দ্যের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বিক্রেতার বিপাক আসে ক্রেতার উপর।

প্রতি বছর ২ লাখ টন কাঁচা আম বিনষ্ট হচ্ছে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নাটোর যেলায় প্রতিবছর ঝড়ের কারণে ২ লাখ মেট্রিকটনেরও বেশী কাঁচা আম বিনষ্ট হয়। এই তিনটি যেলায় আম প্রক্রিয়াকরণের কোন কারখানা নেই। এখানে এ ধরনের কারখানা থাকলে এসব ঝড়ে পড়া আম প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব হ'ত।

রাজশাহীর ফল গবেষণা কেন্দ্রের প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ যেলায় ৫টি থানায় ১২ হাযার হেকটর জমিতে ৭ লক্ষাধিক আম গাছ রয়েছে। এসব আম গাছ থেকে প্রতিবছর ২ লাখ ৫০ হাযার মেট্রিকটন আম উৎপাদন হয়। এর মধ্যে ১ লাখ মেট্রিকটন কাঁচা আম বিনষ্ট হয়। এ ছাড়া রাজশাহী যেলায় প্রতিবছর ২ লাখ মেট্রিকটন আম উৎপাদন হয়। এর মধ্যে প্রতিবছর ৮৫ হাযার টন কাঁচা আম বিনষ্ট হয়।

দেশে প্রতি বছর ৬০ হাযারেরও বেশী লোক যক্ষ্মায় মারা যায়

'যক্ষ্মা মুক্ত নির্মল বায়ু চাই' এই শ্লোগানের মধ্য দিয়ে গত ২৩ মার্চ পালিত হয় বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস। যক্ষ্মায় বাংলাদেশে প্রতিবছর ৬০ হাযারেরও বেশী লোক মারা যায়। প্রতি ২ মিনিটে একজন যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় এবং প্রতি ১০ মিনিটে ১ জন মারা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী এবং সমগ্র বিশ্বে যক্ষ্মা আক্রান্তের দিক থেকে বাংলাদেশের স্থান চতুর্থ। ১৯৯৭ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে যক্ষ্মা-সংক্রমিত রোগীর হার সারা বিশ্বের ৩.৬%।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে ৬ লাখ লোকের যক্ষ্মা-সংক্রামন রয়েছে এবং প্রতিবছর আরো ৩ লাখ লোকের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ইউনিসেফ তথ্য বিবরণী থেকে একথা জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিবছর বিশ্বে ১০ লাখ মহিলা যক্ষ্মায় মারা যায়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফর

দীর্ঘ দিনের জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম জেফারসন ক্লিনটন নিজ কন্যা, শাশুড়িসহ বিশাল বহরের সফরসঙ্গী নিয়ে সপ্তাহব্যাপী দক্ষিণ এশিয়া সফরের প্রথমে গত ২০শে মার্চ ঢাকায় পৌঁছেন। প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমাদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানান।

ক্লিনটন বাংলাদেশ সফরে এসে তার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম বাতিল করে দেন। এর মধ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে না যাওয়া ও বঙ্গবন্ধু জাদুঘর পরিদর্শন না করা অন্যতম। ক্লিনটন ঢাকাতে অবস্থানকালে নিরাপত্তাজনিত কারণে তার নির্ধারিত গাড়ীটি পরিবর্তন করেন। ক্লিনটন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে সরকারীভাবে আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দেশের অগ্রগতি ও অবনতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। ক্লিনটন বণিকদের সাথে পৃথক বৈঠক করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া মধ্যাহ্ন ভোজ মিঃ ক্লিনটন প্রত্যাখ্যান করেন। বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে যে সাহায্যের আশা করেছিল তাও ভেস্তে যায়। কেবল ১০ কোটি ডলার খাদ্য সহায়তা ছাড়া সুনির্দিষ্ট কোন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বিরোধীদল ও সচেতন মহল এর মতে, সবই বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা। তারা বলেন, সরকার ক্লিনটনের আগমনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকঢোল পিটিয়ে, ঢাকা শহরে অঘোষিত কার্ফ্যু জারি করে, কোটি কোটি টাকা ব্যয় আর ক্ষতি করে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

বিল ক্লিনটনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে না যাওয়ার পিছনে বর্তমান সরকারকে দায়ী করা হয়েছে। কারণ তারা এদেশের তালেবান-মৌলবাদের জিগির তুলে বিভিন্ন তথ্য এমনকি বই লিখে মার্কিন গোয়েন্দার কাছে ও সরকারের কাছে প্রেরণ করে। এছাড়া অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে যে, বিল ক্লিনটন জাতীয় স্মৃতি সৌধ ও বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে না যাওয়ার পিছনে তাদের গোপন পররাষ্ট্র নীতিও কাজ করেছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে তৎকালীন মার্কিন রিপাবলিকান সরকার বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। যদিও বিল ক্লিনটনের ডেমোক্রেটিক দল সেসময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। কিন্তু ক্লিনটন তখন ছিলেন কেবল ব্যক্তি মাত্র। আজ তিনি সে দেশের প্রেসিডেন্ট। তাই সঙ্গত কারণেই আমেরিকানদের মতে প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন না।

বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। বিল ক্লিনটন বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে একটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এদেশের সরকারি ও বিরোধীদল তাদের সামনে সেদিন এ সম্পর্কিত কিছুই তুলে ধরেননি।

উল্লেখ্য, বিল ক্লিনটন ঐ দিনেই তার ১২ ঘন্টার সফর শেষ করে ভারতে পৌঁছেন। দীর্ঘ ৫ দিনের ভারত সফর শেষে তিনি গত ২৫শে মার্চ কয়েক ঘন্টার জন্য পাকিস্তান সফর করেন। এ সময় তিনি প্রেসিডেন্ট রফীক তারার ও সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠক করেন।

পবিত্র হজ্জব্রত পালন শেষে ডঃ গালিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

সঊদী আরব সরকারের আমন্ত্রণে রাজকীয় মেহমান হিসাবে পবিত্র হজ্জব্রত পালন শেষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব গত ২৩শে মার্চ সকালে ঢাকায় অতঃপর দুপুরে রাজশাহীতে অবতরণ করেন। তিনি ১০ই মার্চ বিকালে সঊদীয়া ফ্লাইটে সঊদী আরব গমন করেন। তিনি সরকারী তত্ত্বাবধানে হারামায়েন শরীফায়েন বিশেষ করে মদীনা মুনাওয়ারার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং রিয়াদের জামে'আতুল ইমাম মালেক সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, সঊদী আরবের মুফতীয়ে আম সহ অন্যান্য বরেন্য ওলামায়ে কেরাম ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রীসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিশিষ্ট মেহমানদের সাথে সাক্ষাত করেন। ফেরার পথে তিনি মদীনা থেকে মক্কায় এসে পুনরায় উমরা করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

মৃত্যু সংবাদ

রসূলপুর ফাযিল মাদরাসা, আড়াই হাযার, নারায়ণগঞ্জ-এর উপাধ্যক্ষ ও বাংলাদুয়ার আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ, ঢাকার খত্বীব মাওলানা মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন সিলেটীর পিতা বিশিষ্ট সমাজ সেবক মৌলভী মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক গত ২০শে মার্চ ২০০০ সোমবার সকাল ৬.৩০ মিনিটে সিলেট যেলার কানাইঘাট থানাধীন বাশবাড়ী গ্রামের নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৯৫ বৎসর। তিনি ২ ছেলে ৩ মেয়ে ও বহু নাতি-পুতি রেখে যান।

সবাইকে স্বাগতম

আর ঢাকা নয় রাজশাহীতেই এখন পাওয়া যাবে ঢাকার মিষ্টি

আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্টমানের বিভিন্ন রকম মিষ্টি, দৈ অর্ডার মাফিক সরবরাহ করি।

বনফুলের মিষ্টি এ যুগের সেরা সৃষ্টি

নিউ বনফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপণী

আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী
ও
শাপলা প্লাজা, স্টেশন রোড, রেলগেট- রাজশাহী।

বিদেশ

এইডস-এর মৃত্যু উপত্যকা আফ্রিকা মহাদেশ

সমগ্র পৃথিবীতেই এইডস ভয়ংকর মৃত্যুদূত হিসাবে চিহ্নিত হ'লেও আফ্রিকায় এটি ছড়িয়ে পড়েছে ধ্বংসাত্মকভাবে। বিশেষ করে সাব-সাহারা এলাকায় এইডস মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। ডিসেম্বর '৯৯ -এর শেষ দিকে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী শুধুমাত্র ১৯৯৯ সালেই ঐ মহাদেশে নতুন ৩.৮ মিলিয়ন লোক এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় এ সংখ্যা ৪৪ হাযার। আফ্রিকায় যে কি ভয়ংকরভাবে এইডস ছড়িয়ে পড়েছে কেনিয়ার একটি শহর থেকে সহজেই তা অনুমান করা সম্ভব। 'কিসুমু' নামক এ শহরের শতকরা ২৩ ভাগ তরুণীই এইচআইভি আক্রান্ত।

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন যে, ২০০০ সালের শেষে পৃথিবীর মোট এইচআইভি এবং এইডস আক্রান্তদের শতকরা ৭০ ভাগই হবে আফ্রিকান। বতসোয়ানার অবস্থা আরো ভয়াবহ। সেখানে প্রতি ৪ জন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের মধ্যে একজন এইচআইভি পজিটিভে আক্রান্ত। লাখ লাখ ইয়াতীম শিশু এখন আফ্রিকায় মানবেতর জীবন-যাপন করছে। এ শিশুরাও মরণব্যাধি এইডসের করাল গ্রাসে নিপতিত। এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২.৫ মিলিয়নে।

বার্লিনের স্কুলগুলো ইসলাম ধর্ম শিক্ষার অনুমতি পেল

বার্লিনের স্কুলসমূহে এখন থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি ইসলাম ধর্মও শিক্ষা দানের অনুমতি দেয়া হবে। সম্প্রতি আদালতের এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই অনুমতি মিলল। ফেডারেল কোর্টের ঐ সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, 'ইসলামিক ফেডারেশন'কে রাষ্ট্র পরিচালিত স্কুলগুলোতে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়া হৌক। 'ইসলামিক ফেডারেশন' ২৫টি তুর্কী মুসলিম গ্রুপের মূল সংগঠন। তুরস্কের ইসলামপন্থী ওয়েলফেয়ার পার্টির সঙ্গে এসব গ্রুপের সম্পর্ক রয়েছে।

আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে ইসলামকে প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক এবং ধর্মনিরেপেক্ষ শিক্ষার পাশাপাশি পড়ানোর অনুমতি দেয়ার জন্য আশির দশক থেকে চলে আসা আইনগত লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। উল্লেখ্য, বার্লিনের স্কুলগুলোতে তুর্কী বংশোদ্ভূত ৩২ হাযার মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে, যা মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার ৭.৫ শতাংশ। বার্লিনের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী হচ্ছে সাবেক যুগোশ্লাভিয়া থেকে আগত মুসলমানরা।

বিবিসি'র প্রতি সপ্তাহের শ্রোতা সংখ্যা ১৫ কোটি ১০ লাখ

বিশ্বের ৪০টিরও বেশী ভাষায় প্রচারিত বিবিসি'র বহির্বিশ্বে

কার্যক্রমের শ্রোতা সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে ১৫ কোটি ১০ লাখ জনে দাঁড়িয়েছে। প্রধান নির্বাহী মার্ক বাইফোর্ড বলেন, বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস সারাবিশ্বে প্রচার মাধ্যমগুলোর মধ্যে অব্যাহত প্রতিযোগিতার মধ্যে কাজ করছে। তাই এ অগ্রগতি অনেক বেশী আনন্দদায়ক। আমরা আন্তর্জাতিক বেতার সম্প্রচারের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছি। প্রতি সপ্তাহে ইংরেজি ভাষার অনুষ্ঠানের শ্রোতার সংখ্যা ৪ কোটি এবং গত এক বছরে ইন্টারনেট সাইট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবিসি'র অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সাফল্য দেখা গেছে বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ায়। আরবী ও চীনা ভাষায় ওয়েবসাইটও তৈরী করা হয়েছে। বিবিসি জানায়, গত জুনে প্রকাশিত তাদের বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেতার, টেলিভিশন ও ইন্টারনেট সাইটের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে ৩৬ কোটি মানুষের কাছে তারা তাদের অনুষ্ঠান পৌঁছাতে পারছে।

চীনে সাবেক ডেপুটি গভর্ণরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

ঘুষ গ্রহণের দায়ে চীনের জিয়াংজি প্রদেশের সাবেক ডেপুটি গভর্ণর হু চ্যাংজিংয়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। সিনহুয়া সংবাদ সংস্থা একথা জানায়। গত ৮ই মার্চ বুধবার সকালে প্রদেশের সুপ্রিম পিপলস কোর্ট মৃত্যু দন্ডাদেশ বহাল রাখায় তা কার্যকর করা হয়। অজ্ঞাত সূত্র থেকে ৬ লাখ ৫৮ হাযার ডলার গ্রহণ এবং ১ লাখ ৯৪ হাযার ৯শ' ডলারের সম্পত্তি অর্জনের দায়ে হু-কে এই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। মিঃ হু এ ব্যাপারে আপিল করেছিলেন। তবে জিয়াংজির হাইকোর্ট তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যথাযথভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তা বাতিল করে দেয়।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে বিশ্বে ভারত শীর্ষে

ভারতে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় সর্বমোট ৮০ হাযার লোকের মৃত্যুর ফলে বিশ্বে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যার দিক দিয়ে ভারত শীর্ষস্থানে রয়েছে। গত ৫ই মার্চ নয়াদিল্লীতে ভারতের একজন বিশেষজ্ঞ এ কথা বলেন। 'সেন্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে'র (সিআরআরআই) উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী এস কে সারিন বলেন, জনসংখ্যা ও যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার কারণে ভারতের মহানগরীগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৃক্ষচূড়ায় সন্তান প্রসব

সোফিয়া পেদ্রো পরিবারের অন্যান্যদের মতো প্রাণ বাঁচাতে নিজেও গাছে চড়ে বসেছিলেন। সম্প্রতি মোজাম্বিকে মহাপ্লাবনের মত বন্যায় মানুষ ও পশুপাখি সবাই যে যেখানে পারে আশ্রয় নিয়েছে। সোফিয়া পেদ্রো ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। বৃক্ষচূড়ায় আশ্রয় নেয়ার ৪দিন পর সেখানেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক ঘন্টা পর একটি হেলিকপ্টার থেকে উদ্ধারকারীরা এসে গাছে চড়ে শিশুটির নাভিমূল কাটে।

বন্দুকধারীদের গুলিতে ৪০ জন শিখ নিহত

ভারত শাসিত কাশ্মীরে অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীদের গুলিতে ৪০ জন শিখ নিহত হয়েছে। রাজধানী শ্রীনগর থেকে ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে চাদি সিংপুরা গ্রামে গত ২০ মার্চ সন্ধ্যায় ভারতীয় সৈন্যদের ইউনিফরম পরিহিত ৩০ জন ব্যক্তি হাতবোমা ও একে-৪৭ বন্দুক সহকারে হামলা চালায়। অস্ত্রধারীরা তল্লাশীর নাম করে শিখ প্রধান এই গ্রামে পুরুষদেরকে পৃথক করে ২টি শিশুসহ মোট ৪০ জনকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে। এ ঘটনার পর জম্মুতে কার্ফ্যু জারি করা হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ভারত কাশ্মীরী স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোকে দায়ী করেছে। অন্যদিকে কাশ্মীরী মুজাহিদরা এ হত্যাকাণ্ডের জন্য ভারতকে দায়ী করেছে। তারা এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, তাদের দীর্ঘ ৫৫ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নস্যাৎ করার জন্য এবং বহির্বিশ্বে তাদেরকে সন্ত্রাসী বানানোর অপচেষ্টায় ভারতের গোয়েন্দারা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। মুজাহিদরা আরও বলেন, মুসলমান ও শিখদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। অনুরূপ বিবৃতি পাকিস্তান সরকারেরও।

যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ইরাকীদের দুর্ভোগে ফেলছে

-কফি আনান

জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান ইরাকের ১শ' ৫০ কোটি ডলারের মানবাধিকার পণ্য সামগ্রী আটকে রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনকে তিরস্কার করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ইরাকের 'তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী' সংক্রান্ত কিছু চুক্তি আটক করায় ইরাকের ২ কোটি লোক দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছে। জাতিসংঘ যখন ইরাকী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন তার বিরোধিতা করছে। আনান নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ব্যবস্থারও কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন, পরিষদের নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে ইরাকের তেল, বিদ্যুৎ, পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবহণ ও টেলিযোগাযোগ খাতসমূহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খাদ্য ও ওষুধের অভাবে বহু লোক মারা যাচ্ছে। মহাসচিব তেল খাতে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে দ্বিগুণ অর্থ সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। বর্তমানে ইরাককে প্রতি ৬ মাস অন্তর ৩০ কোটি ডলারের তেল বিক্রির অনুমতি দেয়া হয়েছে।

মুসলিম জাহান

পাকিস্তান ভারতে আঘাত হানতে সক্ষম পরমাণু সজ্জিত ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করছে

পাকিস্তান ভারতে আঘাত হানতে সক্ষম পারমাণবিক সমরাস্ত্র সজ্জিত বিপুলসংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরীর প্রস্তুতি নিচ্ছে। গত ১৪ই মার্চ একটি মার্কিন অলাভজনক বিজ্ঞানী সংস্থা এ খবর দিয়েছে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার বিষয় দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং ম্যানহাটান প্রকল্পের সদস্যদের স্থাপিত 'ফেডারেশন অব আমেরিকান সায়েন্টিষ্ট' সম্প্রতি তাদের নতুন উপগ্রহ ইমেজের মাধ্যমে প্রাপ্ত একটি তথ্যের ভিত্তিতে এ খবর পরিবেশন করে। তাদের এই স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ ইমেজে পাকিস্তানের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র স্থাপনার ইমেজ চিত্র ধরা পড়ে।

উক্ত গ্রুপ জানায়, এই ইমেজ চিত্রে দেখা গেছে যে, পাকিস্তানের খুশাব প্লুটোনিয়াম উৎপাদন পারমাণবিক চুল্লির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। এই পারমাণবিক চুল্লির প্লুটোনিয়াম এম-১১ ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য হালকা ওজনের পারমাণবিক ওয়ারহেড বা সমরাস্ত্র তৈরীতে ব্যবহার করা যেতে পারে। পাকিস্তান ১৯৯০ দশকের গোরার দিকে চীনের কাছ থেকে এ ধরণের এম-১১ ক্ষেপণাস্ত্র কিনেছে বলে গ্রুপটি জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সারগোদা মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে রাখা হয়েছে। সেখানে পাকিস্তান ভ্রাম্যমান ক্ষেপণাস্ত্র লাঞ্চারসহ অন্যান্য যানবাহনের জন্য অন্তত এক ডজন গ্যারেজ নির্মাণ করেছে। উপগ্রহ ইমেজ চিত্র সংগ্রহকারী ও বিতরণকারী সংস্থা 'পাবলিক আই প্রজেক্ট'-এর পরিচালক জন পাইক বলেন, পাকিস্তান ভারতের বিভিন্ন নগরী ও সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত হানতে সক্ষম বিপুল সংখ্যক পারমাণবিক সমরাস্ত্র সজ্জিত ক্ষেপণাস্ত্র তৈরীর প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেছে।

আততায়ীর গুলিতে নওয়াজ শরীফের আইনজীবী নিহত

পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের একজন আইনজীবী গত ১০ মার্চ করাচীতে অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। সন্ত্রাস দমন মামলায় শরীফের আইনজীবী প্যানেলের অন্যতম প্রধান আইনজীবী ইকবাল রাধ এবং অপর দু'জন ব্যক্তি করাচীর দক্ষিণাঞ্চলে তার অফিসের আভ্যন্তরে নিহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আততায়ীরা তিনতলায় জনাব রাধের দফতরে ঢুকে তাদের প্রতি সরাসরি গুলি বর্ষণ করে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। নিহত অপর দু'জনের একজন হচ্ছেন তার অফিস সহকারী এবং অপরজন হচ্ছেন হাইকোর্টের একজন বিচারপতির পুত্র। এই খুনের ঘটনার ক'দিন আগে থেকেই জনাব ইকবাল রাধকে টেলিফোনে খুনের হুমকি দেয়া হচ্ছিল বলে নওয়াজ শরীফের দল মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ জানান।

উল্লেখ্য, গত অক্টোবরে সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর নওয়াজ শরীফ, তার ভাই শাহবাজ শরীফ ও তাদের আরো ৫জন সহযোগীর বিরুদ্ধে বিমান ছিনতাই, অপহরণ, প্রাণনাশের চেষ্টা ও সন্ত্রাসের অভিযোগে করাচীর একটি সন্ত্রাসবিরোধী আদালতে বিচার চলছে।

এদিকে সামরিক সরকার প্রধান জেনারেল পারভেজ মোশাররফ সন্ত্রাসীদের হাতে একজন প্রখ্যাত আইনজীবীর হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে অবিলম্বে অপরাধীদের খুঁজে বের করে আদালতে হাযির করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে সরকারী বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

চেচনিয়া ঘটনায় ক্রুদ্ধ আরবদের শান্ত করতে রুশ প্রচেষ্টা

যুদ্ধ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে

-সঊদী যুবরাজ

চেচনিয়ায় রুশ বাহিনীর হামলার কারণে আরব দেশগুলোর ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য রাশিয়া আরবলীগের একটি প্রতিনিধি দলকে স্বাধীনতাকামী উক্ত প্রজাতন্ত্র সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। গত ৪ঠা মার্চ শনিবার ২২ সদস্যের আরবলীগের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মিসর সফররত রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী টগর ইভানভ এই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে অবশ্য কোন প্রতিনিধিদল চেচনিয়া যাচ্ছে কি-না তা বলা হয়নি। আরব বিশ্বের লাখ লাখ মুসলমান চেচনিয়ায় ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ইতিমধ্যে কয়েকটি আরব দেশ চেচনিয়ায় সাহায্য প্রেরণ করেছে এবং চেচনিয়ায় সামরিক অভিযান বন্ধে মস্কোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

মিঃ ইভানভ গত ৪ঠা মার্চ শনিবার লোহিত সাগরের তীরবর্তী শার্ম আল-শেখ অবকাশ কেন্দ্রে মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মিসরের বার্তা সংস্থা 'মেনা' জানায়, তাদের মধ্যকার

আলোচনায় চেচনিয়া সমস্যা সমাধান এবং মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার বিষয় স্থান পায়। পরে মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমর মূসা'র সাথে আলোচনাকালে মিঃ ইভানভ চেচনিয়া সংঘাতের দরুন আরব বিশ্বের সাথে রাশিয়ার ঐতিহাসিক সম্পর্ক ক্ষুন্ন হওয়ার কথা অস্বীকার করেন।

এদিকে মিসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মিসর সফরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়া শহরে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। অন্যদিকে রুশ দূত রমজান আব্দুল লতীফ সঊদী যুবরাজ আব্দুল্লাহ্'র সাথে সাক্ষাৎ করেন। যুবরাজ তাকে বলেন, চেচনিয়ায় যুদ্ধ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, মুসলমানদের আরো রক্তক্ষয়ের পরিবর্তে উভয় পক্ষকে আলোচনায় বসে এ সমস্যার সমাধান করা উচিত।

ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পীকার ছুরিকাহত

দু'জন আততায়ী গত ৫ই মার্চ ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ওয়াহিদের রাজনৈতিক দলের নেতা ও সেদেশের পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পীকার মাতোরি আব্দুল জলীলের উপর হামলা চালায় এবং তাকে ছুরিকাঘাত করে। জাকার্তার দক্ষিণাঞ্চলের একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, যে দু'জন আততায়ী মাতোরি আব্দুল জলীলের উপর হামলা চালায় তাদের একজনকে জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলে এবং অপরজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মাতোরি তার বাড়ী পরিদর্শনের সময় হামলা চালানো হয়। মাতোরিকে পরে জাকার্তার পূর্বাঞ্চলে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

তাজিকিস্তানে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের জয়লাভ

তাজিকিস্তানের পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট এমোমালী রাখমনোভ -এর 'দ্য পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি' শতকরা ৬০ ভাগ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছে। প্রাথমিক ফলাফলে এ খবর জানা যায়। ইতার তাস বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, এ নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টি শতকরা ২০ ভাগ ভোট পেয়েছে। 'দ্য ইসলামিক রেনেসাঁ পার্টি' পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করতে প্রয়োজনীয় শতকরা পাঁচ ভাগ ভোট পেয়েছে। তাদের প্রাপ্ত ভোটের হার শতকরা ৭.৫ ভাগ।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

অত্যাধুনিক 'হৃদপিণ্ড-ফুসফুস' যন্ত্র

বিজ্ঞানীরা নতুন সংস্করণের অত্যাধুনিক একটি 'হৃদপিণ্ড-ফুসফুস' যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, যা একটানা কয়েক সপ্তাহ ধরে রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারে। এর ফলে বহু সংকটাপন্ন রোগী যাদের আরোগ্য লাভের জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে শিকাগোতে প্রকাশিত এক সমীক্ষায় এ কথা বলা হয়েছে। মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে আবিষ্কৃত এ যন্ত্রটি পায়ের ও ঘাড়ের ধমনীতে সংযোজন করে ১৯৮০ সাল থেকে এ পর্যন্ত মৃত্যুর সমূহ সম্ভাবনা ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। বহনযোগ্য যন্ত্রটি ব্যাটারি চালিত রেসপেরেটরী ফেলিউরসহ শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত ৫৮৬ জন নবজাতকের দেহে এটি সংযোজন করে ৮৮ শতাংশ সুফল পাওয়া গেছে।

আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের জার্নালে প্রকাশিত এক সমীক্ষায় বলা হয়, শ্বাস ত্রুটিতে আক্রান্ত ১৩২ জন শিশুর উপর এ পদ্ধতি প্রয়োগের ৭০ শতাংশ সুফল পাওয়া গেছে এবং বয়স্ক ১৪৬ জন রোগী ৫৬ শতাংশ আরোগ্য লাভ করেছে। এমন মুমূর্ষু রোগী, যাদের হৃদযন্ত্র যে কোন সময় বন্ধ হ'তে পারে, তাদের উপর এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ১০৫ জন শিশুর মধ্যে প্রায় অর্ধেক এবং বয়স্ক ৩১ জন রোগীর মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভাল ফল পাওয়া গেছে।

স্বয়ংক্রিয় যান 'কম্পুকার'

সড়ক দুর্ঘটনা বর্তমানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। গাড়ী দুর্ঘটনার মূল কারণ চালকের অসতর্কতা ও অজ্ঞতা। এ জন্য বিজ্ঞানীরা এ শতকে আমাদের স্বয়ংক্রিয় গাড়ী উপহার দিচ্ছেন, যা মানবচালিত না হয়ে কম্পিউটার নির্ভরশীল হবে। ফলে সকলের ভ্রমন হয়ে উঠবে নিরাপদ এবং স্বচ্ছল। কম্পিউটারের মধ্যে কোন আবেগ-অজ্ঞতা নেই, যা একজন মানুষমাত্রই বিদ্যমান। সঠিক প্রোগ্রামে নিখুঁতভাবে গাড়ী নিয়ন্ত্রণ করাই হবে এর কাজ। বিপদে একজন মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে সময় ব্যয় করে সেখানে এই গাড়ী নিমিষেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেগী মেলন ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা ফলপ্রসূ এবং উন্নত তত্ত্বাবধানে এই 'কম্পুকার' গাড়ী বাজারে আসবে।

শিশুর শ্রবণশক্তি যাচাইয়ের সুটকেস!

সদ্যজাত শিশুর শ্রবণশক্তি যাচাইয়ের জন্য ইংল্যাণ্ডের হিলিংডন হসপিটাল এবং ব্রনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। বন্ধ করা অবস্থায় এটা দেখলে ব্রিফকেস বা সুটকেসই মনে হবে। এর মধ্যে আছে একটি বিশেষ ধরনের 'ম্যাট্রেস' বা গদি। শিশুকে এর ওপরে শুইয়ে দিলে বাইরের শব্দ তার শরীর কি রকম সাড়া দিচ্ছে, তা ধরা পড়ে। গদি থেকে তার মাধ্যমে সেটি পরীক্ষকের কানে লাগানো হেডফোনে পৌঁছে যায়। শিশুর কানেও লাগানো থাকে 'এয়ারফোন'। যা দিয়ে শিশু কানে কতটা শুনতে পাচ্ছে সেটিও যাচাই করা যায়। শ্রবণশক্তির ঘাটতি ধরা পড়লে চিকিৎসকগণ অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

বুলেট প্রুফ কাপড়

জীবনের ঝুঁকি কার নেই? তাই ঝুঁকিপূর্ণ জীবনের জন্য তৈরী করা হয়েছে বুলেট প্রুফ কাপড় 'কেভলার'। যথেষ্ট হালকা ওজনের স্টিলের চেয়ে পাঁচগুণ শক্ত ও মজবুত এই বুলেট প্রুফ কাপড় কেভলার। কাপড়ের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য কাপড়ে পলেষ্টারের সংমিশ্রণ দেয়া হয়েছে। এটা সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ঝুঁকিপূর্ণ পেশাজীবীদের জন্য নিঃসন্দেহে সুখবর।

ফটোষ্ট্যাট মেশিন ব্যবহারকারীদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ফটোষ্ট্যাট মেশিনের (জেরক্স) সাথে যুক্ত কর্মীদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল শাখার গবেষকরা ক্যান্সারের উৎস খুঁজে পেয়েছেন এক রাসায়নিক পদার্থে, যার নাম 'নাইট্রোপাইরিন'। ফটোষ্ট্যাট মেশিনে যারা কাজ করেন তাদের প্রায়ই নাইট্রোপাইরিনের সংস্পর্শে আসতে হয়। গবেষকরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন যে, নাইট্রোপাইরিন ব্যাকটেরিয়া কোষের জেনেটিক মিউষ্টেশন ঘটাতে সফল। তাই তারা নাইট্রোপাইরিন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে ফটোষ্ট্যাট মেশিনে দীর্ঘ সময় কর্মরত কর্মীদের ওপর ঐসব নাইট্রোপাইরিনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার আশংকা রয়েছে। আর তা থেকেই ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আংশকা বাড়ছে।

মানবদেহের জন্য কৃত্রিম রক্ত আবিষ্কৃত

আপদে-বিপদে রক্তের জন্য মানুষকে আর হাহাকার করতে হবে না। স্কটল্যাণ্ডের পিপিএল থেরাপিউটিকস সংস্থা ভেড়া ও গরুর দুধ থেকে মানবদেহের জন্য উপযোগী এক ধরনের কৃত্রিম রক্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। পিপিএল-এর বিজ্ঞানীরা দেখেছেন গরু এবং ভেড়ার দুধে যে এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন থাকে তা মানবদেহের জন্য রক্ত তৈরী করতে সক্ষম। কৃত্রিম এ রক্ত আবিষ্কারের ফলে অদূরভবিষ্যতে রক্তের অভাবে মানুষের যে প্রাণহানি ঘটত, তা বহুলাংশে কমে যাবে।

এইডস নিরাময়ে মধু!

অতি সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কিরো ডিভিশন অব মলিকিউলার সায়েন্সের প্রধান গবেষণা কর্মকর্তা বাংলাদেশী বিজ্ঞানী অধ্যাপক আহমাদ আব্দুল্লাহ আজাদের নেতৃত্বে একদল গবেষক বলেন, মধু থেকে তৈরী ওষুধ এইডস নিরাময় করতে পারে। তাদের গবেষণায় মৌমাছির কলোনী ও মৌমাছির দেহজাত নির্যাস থেকে নির্বাচিত প্রোটিন সংগ্রহ করে একটি ওষুধ প্রস্তুত করেন, যা এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর শরীরে রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের আরেক বিজ্ঞানী ডাঃ আব্দুর রায্যাক মৌমাছি ও মৌমাছি পরের 'হাইমেনোপটেরা' গোত্রের হাজারখানেক পতঙ্গের যে কোন প্রজাতির দেহজাত নির্যাস থেকেও 'হাইমেনোকেস' নামক এইডস নিরাময়কারী একটি ওষুধ উদ্ভাবন করেন।

স্বাস্থ্যকর কাপড়

অতি সম্প্রতি বাজারে এক ধরনের কাপড় এসেছে, যা পরলে একজিমা, চর্মরোগ, বিখাউজ, দাউদ, খুঁজলি-পাচড়া হয় না। সামুদ্রিক কাঁকড়ার খোলক এবং পলিষ্টারের সংমিশ্রনে তৈরী এ কাপড়ের নাম 'চিতোপলি'। রোগ প্রতিরোধকারী বলে এ কাপড়কে স্বাস্থ্যকর মেডিকেটেড কাপড়ও বলা হয়। খুব শিগগিরই এটি ব্যবহার করা যাবে।

বিস্ময়কর পোশাক

বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তরে ছিদ্র হওয়াতে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে চলে আসছে। এতে যেমন আবহাওয়াগত বিপর্যয় বাড়ছে, তেমনি ত্বক ক্যান্সার সহ হাযারটা রোগের কারণ ঘটছে। সম্প্রতি চীনের বিজ্ঞানীরা বলছেন, তারা এক ধরনের পোশাক বানিয়েছেন যা অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিরোধে সক্ষম। পরীক্ষায় জানা যায় যে, সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মির ৯০ ভাগই শোষণ করতে সক্ষম এ পোশাক।

তাবলীগী ইজতেমা ২০০০-য়ে প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহের সার সংক্ষেপ

(গত সংখ্যার পর)

(১২) আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(চাঁপাই নবাবগঞ্জ)

হাম্দ ও ছানার পর পূর্ব নির্ধারিত **'জান্নাত ও জাহান্নাম'** বিষয়ের প্রথমে জাহান্নাম সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, জাহান্নাম মূলতঃ একটি কষ্টদায়ক ও পীড়াদায়ক জায়গা। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ – وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ – نَارٌ حَامِيَةٌ –

'কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে 'হাবিয়া'। উহা কী, তা কি তুমি জান? উহা অতি উত্তপ্ত অগ্নি' (ক্বারি'আ ৮-১১)।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِّلطَّاغِيْنَ مَآبًا – لَّبِثِيْنَ فِيْهَا أَحْقَابًا – لاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلاَ شَرَابًا – إِلاَّ حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا – 'নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে। তা সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তন স্থল। সেথায় তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেথায় তারা আস্বাদন করবে না শৈত্য, না কোন পানীয়। ফুটন্ত পানি ও পূঁজ ব্যতীত' (নাবা ২১-২৫)।

যারা জাহান্নামী হবে তাদের খাদ্য হবে যাক্কুম গাছ। মহান আল্লাহ বলেন, أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ – إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ – إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ – طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ –

'(জাহান্নামীদেরকে) আপ্যায়নের জন্য কি ইহাই শ্রেয় না যাক্কুম বৃক্ষ? যালিমদের জন্য আমি ইহা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ, এই বৃক্ষ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হ'তে, ইহার মোচা যেন শয়তানের মাথা' (ছাফ্ফাত ৬২-৬৫)।

যাক্কুম বৃক্ষ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ – طَعَامُ الْأَثِيْمِ – كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ – كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ – خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ – ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ – 'নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হ'বে পাপীর খাদ্য, তা গলিত তাম্রের মত; উহা তার উদরে ফুটন্ত পানির মত ফুটতে থাকবে। (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও' (দুখান ৪৩-৪৮)।

তিনি বলেন, জাহান্নাম সত্যিই বড় কষ্টের জায়গা। মহান আল্লাহ বলেন, سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ – وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لاَ تُبْقِيْ وَ لاَتَذَرُ – 'আমি তাকে নিক্ষেপ করব 'সাকার'-এ। তুমি কি জান 'সাকার' কী? উহা (জাহান্নামীকে) জীবিতাবস্থায় রাখবেনা ও মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দেবে না' (মুদ্দাছ্ছির ২৬-২৮)।

জাহান্নামীদের শাস্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ – 'যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই উহার স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে....' (নিসা ৫৬)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে বলেছেন,

نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْأً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْأً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا–

'তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের (উত্তাপের) সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! (জাহান্নামীদের শাস্তি দানের জন্য) দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, দুনিয়ার আগুনের উপর উহার সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরও উনসত্তর ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত-আলবানী হা/৫৬৬৫)*।

ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামকে সত্তর হাযার ফেরেশতা টেনে নিয়ে আসবে। এ মর্মে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا–

'ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, উহার সত্তরটি লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাযার ফেরেশতা থাকবে, তারা উহা টেনে আনবে' *(মুসলিম, মিশকাত-আলবানী হা/৫৬৬৬)*।

জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দোযখীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে আগুনের ফিতাসহ দু'খানা জুতা পরানো হবে। এতে তার মগজ এমনভাবে ফুটতে থাকবে, যেমন তামার পাত্র ফুটতে থাকে। সে ধারণা করবে তার অপেক্ষা কঠিন আযাব আর কেউ ভোগ করছে না। অথচ

সে হবে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-আলবানী হা/৫৬৬৭)*।

মানুষের পাপানুসারে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দোযখীদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন হবে, দোযখের আগুন তার পায়ের টাখনু পর্যন্ত পৌঁছবে। তাদের মধ্যে কারও হাঁটু পর্যন্ত আগুন পৌঁছবে, কারো কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো গর্দান পর্যন্ত পৌঁছবে' *(মুসলিম, মিশকাত-আলবানী হা/৫৬১৭)*।

অতঃপর তিনি জান্নাত সম্পর্কে বলেন, সৎ লোকদের জন্য জান্নাত হবে অনন্ত সুখের আধার। আল্লাহ বলেন,

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ - فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ-

'সেদিন যার পাল্লা ভারী হবে, সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন' (ক্বারি'আ ৬-৭)।

জান্নাতের সুখ-শান্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَا أَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج وَأَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ج وَأَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ج وَأَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ط

'মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হ'ল- উহাতে আছে নির্মল পানির নহর। আছে দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর। আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেথায় তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা' (মুহাম্মাদ ১৫)।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, - فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ - وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ - وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ - وَّمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ - وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ - 'তারা থাকবে এমন উদ্যানে, যেখানে আছে কণ্টকহীন ফুলবৃক্ষ, কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ (কলা গাছ), সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবহমান পানি ও প্রচুর ফলমূল' (ওয়াক্বি'আ ২৮-৩২)।

বেহেশতের আরাম-আয়েশের বর্ণনা দিয়ে সূরা আর-রাহমানে আল্লাহ বলেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ - ذَوَاتَا أَفْنَانٍ - فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ - فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ - مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ط وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ - فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ - كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ -

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান; উভয়ই বহু শাখা পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবহমান দু'প্রস্রবণ। উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দু'প্রকার। সেথায় তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর-বিশিষ্ট ফারাশে (বিছানায়)। দু'উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। তথায় থাকবে আনতনয়না রমনীগণ, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করে নাই; তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ (আর-রাহমান ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৪, ৫৬ ও ৫৮)।

জান্নাতে প্রত্যেকের জন্য থাকবে গোলাম বা খাদেম। মহান আল্লাহ বলেন, وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ج اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا - 'তাদেরকে পরিবেশন করবে চিরকিশোরগণ, তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা' (দাহার ১৯)।

পরিশেষে তিনি উপস্থিত জনতাকে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে বেঁচে থেকে চির সুখের আবাস জান্নাতে যাওয়ার জন্য সৎ আমল করার আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

(১৩) মাওলানা মোশাররফ হোসাইন আকন্দ (ঢাকা)

তিনি 'খতমে নবুঅত' সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াত-এর উদ্ধৃতি দেন। মহান আল্লাহ বলেন, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ - 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী' (আহযাব ৪০)।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইবনু জারীর ত্বাবারী, হাফেয ইবনু কাছীর, ইমাম শাওকানী, আল্লামা শিহাবুদ্দীন আলূসী ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় একমত যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তাঁর পরে আর কোন রাসূল ক্বিয়ামত অবধি আসবেন না। মাঝখানে ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে এসে নিজেদেরকে উম্মতে মুহাম্মাদী বলে পরিচয় দিবেন এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হবেন। অতএব উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সর্বশেষ নবী।

তিনি বলেন, বর্তমানে কাদিয়ানীরা মুসলমানদের জন্য এক বিরাট সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। তারা বলে যে, আমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে স্বীকার করি কিন্তু সর্বশেষ নবী বলে স্বীকার করিনা। অর্থাৎ তাঁর পরেও

নবী আসবে। তিনি বলেন, এখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরে কারো নবী হওয়ার অবকাশ থাকত, তবে মুসাইলামাতুল কাযযাব সহ আরো কিছু ভণ্ড নবীর যখন আবির্ভাব হয়েছিল, তখন কেন হযরত আবুবকর, ওমর, আলী ও ওছমান (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন? যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরে নবী হওয়ার অবকাশ থাকত, তবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। অতএব বুঝা গেল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সর্বশেষ নবী। একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। নচেৎ মুসলমান থাকা যাবে না। 'খতমে নবুঅত' অস্বীকারকারীদেরকে বিশ্ব ওলামায়ে কেরাম কাফের বলে ফৎওয়া দিয়েছেন।

অতঃপর তিনি 'খতমে নবুঅত' সম্পর্কে কুরআন থেকে বেশ কয়েকটা দলীল পেশ করেন। যেমন-

১. মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্ম সমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন' (মুহাম্মাদ ২)।

২. 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি' (আম্বিয়া ১০৭)। যদি তাঁর পরে অন্য কারো নবী হওয়াব সম্ভাবনা থাকত, তাহ'লে আল্লাহ্র রাসূলকে লক্ষ্য করে একথা বলা হ'ত না। যখন অন্য কোন নবীর কথা এখানে বলা হয় নাই। অতএব কাদিয়ানীদের নবী হওয়ার দাবী ধোকা ও প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

৩. 'আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' (সাবা ২৮)।

৪. 'আমার প্রতি এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে- যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এই কুরআন পৌঁছে সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি' (আন'আম ১৯)।

খতমে নবুঅত সম্পর্কে উক্ত আয়াতগুলো থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সর্বশেষ নবী ও রাসূল।

অতঃপর এতদ্বিষয়ে হাদীছের কিছু বর্ণনাও তিনি উল্লেখ করেন। যেমন-

١- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ لِيْ أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِيْ الَّذِيْ يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْئٌ-

১. হযরত জুবাইর বিন মুত্বঈম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার কতকগুলো নাম রয়েছে। আমার এক নাম মুহাম্মাদ অপর নাম আহমাদ এবং আর এক নাম মাহী। আর মাহী এজন্য যে, আমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কুফরকে নিঃশেষ করে দিবেন। আমি হাশের। কারণ সমস্ত মানুষ আমার পদদ্বয়ের তলে জড়ো হবে। আর আমি 'আক্বিব। আর 'আক্বিব তাকে বলা হয় যার পরে আর কোন কিছু থাকেনা' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত-আলবানী হা/৫৭৭৬)*।

২. রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার ও পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হ'ল এরূপ- যেমন একটি প্রাসাদ। যা সৌন্দর্যমন্ডিত করে নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এক স্থানে একটি ইটের জায়গা খালি রাখা হয়েছে। অতঃপর লোকেরা উহা ঘুরে দেখে বিস্মিত হয় যে, উহার নির্মাণ কত সুন্দর! কিন্তু একটি ইটের জায়গা খালি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমিই উক্ত খালি ইটের স্থানটি পূর্ণ করি। আমার দ্বারাই উক্ত প্রাসাদটি সমাপ্ত করা হয়েছে এবং আমার দ্বারাই নবী আগমনের সিলসিলা শেষ করা হয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৫)*।

কুরআন ও হাদীছের উপরিউক্ত বক্তব্য প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পর কস্মিনকালেও আর কোন নবী আসবে না।

পরিশেষে তিনি খতমে নবুঅতে অস্বীকারকারী কাদিয়ানীদের কাফের বলে ঘোষণা দেন এবং সাথে সাথে বর্তমান কিছু কুচক্রী মহলের 'আহলেহাদীছদেরকে' কাদিয়ানী ও শী'আ নামে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

(১৪) মাওলানা মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ (পাবনা)

হাম্দ ও ছানার পর তিনি **'বিদ'আতের সংজ্ঞা ও তার ভয়াবহ পরিণতি'** সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ'আত অনুপ্রবেশ করেছে। বিদ'আতের বিরুদ্ধে কথা বললেই আজ তাকে সমাজের ভাঙ্গনকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। বিদ'আত এমন একটি মহামারী ব্যাধি, যে ব্যাধির চিকিৎসা নেই। অর্থাৎ ক্যান্সার সদৃশ।

তিনি বলেন, যারা চোরী বা ডাকাতি করে, তারা চোরীকে বা ডাকাতিকে খারাপ কাজ জ্ঞান করেই করে। কিন্তু যারা শিরক-বিদ'আত করে, তারা এটাকে ভাল জ্ঞান করেই করে থাকে। ফলে তাদের সংশোধনের কোন পথ খোলা থাকে না। বিদ'আতকারীরা নিজে নিজে অনেক আমল করেছি মনে করে। কিন্তু এই আমল তাদের কোনই কাজে আসবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে' (কাহফ ১০৪)। সুতরাং বিদ'আত সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে।

তিনি শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, বিদ'আতী ব্যক্তির তওবা নছীব হয় না। কারণ বিদ'আতী ভাল কাজ মনে করেই বিদ'আত করে থাকে। সুতরাং তওবা করার তো কোন প্রশ্নই ওঠেনা। আর অন্যান্য কবীরা-ছগীরা গোনাহ যারা করে থাকে, তারা মৃত্যুর আগে তওবা করার সুযোগ পায়। কারণ তারা তা পাপ মনে করেই করে থাকে।

তিনি বলেন, বিধর্মীরা যখন মুসলমানদেরকে অসিতে হারাতে ব্যর্থ হ'ল, তখন তারা ইসলামের ক্ষতি সাধনের নিমিত্তে ধর্মীয় লেবাস পরে ইসলামের মধ্যে শিরক-বিদ'আতের সংমিশ্রন ঘটাতে লাগল।

তিনি বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে هو الشيئ المخترع لاعلى مثال سابق অর্থাৎ 'পূর্ব নযীর বিহীন আবিষ্কৃত বস্তু'। শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত হচ্ছে, هى طريقة مخترعة فى الدين تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه

অর্থাৎ 'বিদ'আত এমন একটি পথের নাম যা দ্বীনের মধ্যে নবাবিষ্কৃত এবং শরীয়ত সদৃশ, সে পথ অবলম্বন করার পিছনে উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ্র বেশী ইবাদত করা' *(শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম ১ম খণ্ড পৃঃ ২৮)*।

বিদ'আত সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে, مَنْ أَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের এই ধর্মে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*।

পরিশেষে বিদ'আতের পরিণতি সম্পর্কে তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। মহানবী (ছাঃ) বলেন, إِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنَنِىْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّىْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِىْ-

'আমি তোমাদের পূর্বেই হাউযে কাওছারের নিকট পৌঁছব। যে ব্যক্তি আমার নিকট পৌঁছবে, সে উহার পানি পান করবে। আর যে একবার পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। আমার নিকটে এমন কিছু লোক আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার ও তাদের মধ্যে আড়াল করে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত! তখন আমাকে বলা হবে আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে এরা কি সব নতুন নতুন মত ও পথ আবিষ্কার করেছে। একথা শুনে আমি বলব, যারা আমার অবর্তমানে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হউক' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭১)*।

(১৫) মাওলানা আব্দুর রহীম (বাগেরহাট)

'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আহল' অর্থ অনুসারী আর 'হাদীছ' অর্থ কথা। হাদীছের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী মিশকাতের ভূমিকায় বলেছেন, 'জেনে রাখ! অধিকাংশ মুহাদ্দিছের পরিভাষায় হাদীছ বলতে নবী (ছাঃ)-এর কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকে বুঝানো হয়েছে'। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সর্বোত্তম হাদীছ অবতীর্ণ করেছেন' (যুমার ২৩)। এখানে হাদীছ বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। অতএব যিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী চলেন, তাকে 'আহলুল হাদীছ' বলা হয়।

তিনি বলেন, বর্তমান সমাজে দ্বীন আছে। কিন্তু দ্বীনে হক্ব নেই। অতএব এ দ্বীনে হক্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** এ দেশে তাদের দা'ওয়াতী অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে যারা যথাযথ অনুসরণ করেন, তারাই আহলুলহাদীছ। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, انا اول صاحب الحديث فى الدنيا 'আমি এ দুনিয়াতে সর্বপ্রথম আহলুলহাদীছ' *(তাযকেরাতুল হুফ্ফায, ১১১ পৃঃ)*। এখানে আবু হুরায়রা (রাঃ) নিজেকে 'আহলুল হাদীছ' বলে পরিচয় দিয়েছেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝানোর নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী আহলেহাদীছ' *(শারফু আছহা-বিল হাদীছ পৃঃ ১২)*। এ থেকে বুঝা গেল যে, রাসূল-এর পরবর্তী অনুসারীরা হবেন আহলেহাদীছ।

পরিশেষে তিনি ক্বিয়ামত অবধি আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহ পাকের তাওফীক কামনা করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

(১৬) আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম (ঢাকা)

হাম্দ ও ছানার পর **'সুন্নাত ও বিদ'আত চেনার মূলনীতি'** বিষয়ে আলোকপাত রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসৃত পথ ও পন্থাই সুন্নাত। আর এর বিপরীত হ'ল বিদ'আত। তিনি সুন্নাত ও বিদ'আত চেনার ছয়টি মূলনীতি উল্লেখ করেন। যথা-

১. **কারণভিত্তিক অনুসরণঃ** আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যে কারণের সাথে যে ইবাদত জড়িত করেছেন, সেই কারণের সাথে আমরা সেই ইবাদত জড়িত করব। যেমনঃ আল্লাহ্র রাসূলের যুগে চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ লাগলে তিনি ছালাত আদায় করেছেন। এমনিভাবে যখনই অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছে, তখনই ইস্তেসক্বার ছালাত আদায় করেছেন। অতএব আমরাও যদি বর্তমানে উক্ত কারণগুলো পাই অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ লাগে তাহ'লে ছালাত আদায় করব এবং অনাবৃষ্টি দেখা দিলে ছালাতুল ইস্তেসক্বা আদায় করব। এ ছাড়া উক্ত কারণগুলোর সাথে অন্য কিছু যুক্ত করাই হবে বিদ'আত।

অপরদিকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এমন অনেক কারণ ছিল, যে কারণের কোন মূল্য তিনি দেননি এবং তার সাথে কোন ইবাদত জড়িত করেননি। অনুরূপভাবে বর্তমানে আমরা যদি সে কারণ পাই, তবে তার সাথে আমরাও কোন ইবাদত জড়িত করব না। কারণ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তা করেননি। আর যদি করি তাহ'লে এটাই হবে বিদ'আত। যেমনঃ রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মদিন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যেহেতু তিনি স্বীয় জীবদ্দশায় জন্মদিবসের সাথে কোন ইবাদত জড়িত করেননি। অতএব আমরাও তার জন্মদিবসের সাথে কোন ইবাদত জড়িত করব না। যদি করি তাহ'লে তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। আর এথেকেই **ঈদে মীলাদুন্নবী** বিদ'আত বলে প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর মি'রাজে গমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ এর মাধ্যমেই আমরা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পেয়েছি। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মি'রাজের দিবসের সাথে কোন অনুষ্ঠান সংযুক্ত করেননি, তাই আমরাও করব না। আর যদি করি তাহ'লে সেটাই হবে বিদ'আত।

২. **প্রকারভিত্তিক অনুসরণঃ** যে প্রকারের ইবাদত রাসূল (ছাঃ) যখন করেছেন, তখন সেই প্রকারের ইবাদত করতে হবে। যদি এর পরিবর্তন করা হয় তাহ'লে সেটা হবে বিদ'আত। আর যদি তা ঠিক রাখা হয়, তাহ'লে সেটা হবে সুন্নাত। যেমন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশের সময় اللهم افتح لى ابواب رحمتك 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার করুণার দ্বার সমূহ খুলে দাও' -এ দো'আ পড়েছেন। এখন যদি কেউ মসজিদে প্রবেশের সময় ربنا لك الحمد পড়ে, তবে সেটা বিদ'আত হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) এ দো'আটি মসজিদে প্রবেশের দো'আ হিসাবে নির্ধারণ করেননি।

অনুরূপভাবে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় যদি اللهم انى اسئلك من فضلك -এর পরিবর্তে ربنا ظلمنا انفسنا বা অন্য কোন দো'আ পড়া হয়, তবে সেটা বিদ'আত হবে। মোদ্দাকথা যে প্রকারের ইবাদত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যখন সেট করেছেন, সে প্রকারের ইবাদত তখন সেই জায়গায় সেট না করলেই তা বিদ'আত হবে।

৩. **পরিমাণ ও সংখ্যাভিত্তিক অনুসরণঃ** আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ইবাদতের যে পরিমাণ ও সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আমাদেরকে তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। যেমন মোট ছালাত সংখ্যা ৫। আর যোহরের ফরয ছালাতের রাক'আত সংখ্যা ৪। এখন যদি আমরা ৬ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি। আর যোহরের ফরয ৪ রাক'আতের পরিবর্তে ৬ রাক'আত আদায় করি, তাহ'লে এটা বিদ'আত হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) যে পরিমাণ ও সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সে অনুযায়ী আমাদের ইবাদত হয়নি।

অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

افضل الذكر لا إله إلا الله

'সর্বোত্তম যিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই)'। এখন যদি কেউ শুধু لا إله (লা ইলাহা) কিংবা الا الله (ইল্লাল্লাহ) কিংবা 'হু হু' করে তাহ'লে তা বিদ'আত হবে। কারণ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) لا إله إلا الله এ সম্পূর্ণ অংশটাকে সর্বোত্তম যিকির বলেছেন। যার কিয়দংশ উচ্চারণ করলে তা আল্লাহ্র রাসূলের নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী হবে না, ফলে তা বিদ'আতে পরিগণিত হবে।

৪. **পদ্ধতিভিত্তিক অনুসরণঃ** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে পদ্ধতিতে যে ইবাদত করেছেন সে পদ্ধতিতে সে ইবাদত করতে হবে। যেমন আগে রুকূ করা ও পরে সিজদা করা। এখন যদি কেউ রুকূ-র আগে সিজদা করে, তবে তা রাসূল (ছাঃ) নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী না হওয়ার কারণে বিদ'আত হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'একাকী ছালাত আদায় করার চেয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে ২৭ গুণ ছওয়াব বেশি হবে' *(বুখারী ও মুসলিম)*। এখন যদি কেউ উক্ত হাদীছের উপর ভিত্তি করে যোহরের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাতও জামা'আত সহকারে পড়ে তবে তা বিদ'আত হবে।

৫. **সময়ভিত্তিক অনুসরণঃ** আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যে সময় যে ইবাদত করেছেন, সে সময় সে ইবাদত করতে হবে। যেমন, ছালাতুল ইস্তেসক্বা, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ছালাত ইত্যাদি।

৬. **স্থানভিত্তিক অনুসরণঃ** যেমন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ফরয ছালাতগুলো মসজিদে আর সুন্নাতগুলো বাড়ীতে পড়েছেন। এখন যদি কেউ বলে, না, সুন্নাতগুলোই মসজিদে আর ফরযগুলো বাড়ীতে পড়তে হবে। তাহ'লে এটা **স্থানভিত্তিক অনুসরণ** না হওয়ার কারণে বিদ'আত হবে।

এরপর তিনি বলেন, কাউকে শিরক বা বিদ'আত করতে দেখলে তাকে মুশরিক বা বিদ'আতী বলার তিনটি মূলনীতি রয়েছে। যথা-

(১) **জ্ঞান থাকাঃ** কেউ যদি জেনে-বুঝে কোন বিদ'আতী বা শিরকী কাজ করে, তবে তাকে বিদ'আতী বা মুশরিক বলা যাবে। আর যদি না বুঝে, কুরআন-হাদীছ না জেনে করে, তবে কাজটাকে বিদ'আত বা শিরক বলা যাবে কিন্তু উহা সম্পাদনকারীকে বিদ'আতী বা মুশরিক বলা যাবে না। এর প্রমাণ একটি হাদীছে আছে, 'এক ব্যক্তি এত পরিমাণ পাপ করে যে, সে আল্লাহ্র পাকড়াও এর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মৃত্যুর সময় তার পরিবারকে মৃত্যুর পর তার লাশ পুড়িয়ে ছাইগুলো নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার অছিয়ত করে যায়। মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরূপ করতে বললে কেন? সে তখন বলল, আপনি যদি আমাকে ধরেন, তবে আমার রক্ষা নেই। এ ভয়েই আমি এরূপ করেছি' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৯)*।

অতএব এ হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, পরকালে আল্লাহ পাকড়াও করবেন এ সম্পর্কে সে অজ্ঞ ছিল। বিধায় তাকে মুশরিক বলা যাবে না।

(২) **ইচ্ছা থাকাঃ** অনিচ্ছায় কেউ যদি কোন শিরক বা বিদ'আত করে, তবে তাকে মুশরিক বা বিদ'আতী বলা যাবে না। কাজটাকে অবশ্যই শিরক বা বিদ'আত বলা যাবে। কিন্তু উহা সম্পাদনকারীকে বিদ'আতী বা মুশরিক বলা যাবে না। অনিচ্ছার কয়েকটি দিক হ'তে পারে। যেমন- কাউকে শিরক বা বিদ'আত করতে বাধ্য করা হচ্ছে। যাকে করানো হচ্ছে সে কাজটাকে শিরক বা বিদ'আত জানে। কিন্তু তাকে যেহেতু কাজটা করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সেহেতু তাকে বিদ'আতী বা মুশরিক বলা যাবে না।

(৩) **স্মরণ থাকাঃ** ইচ্ছার পরে স্মরণ না থাকলে তাকে বিদ'আতী বা মুশরিক বলা যাবে না। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল জাহমিয়াদেরকে বলেছিলেন, لو قلت مثل ما تقولون لكفرت بالله ولكن لكم لستم كفارا لانكم عندى جهال-

'তোমরা যেরূপ কথাবার্তা বল, আমিও যদি সেরূপ বলতাম তাহ'লে কাফের হয়ে যেতাম। কিন্তু তোমাদেরকে আমি কাফের বলতে পারি না। কারণ তোমরা আমার কাছে অজ্ঞ'।

উপরিউক্ত মূলনীতির নিরিখে কাউকে বিদ'আতী বা মুশরিক বলা যাবে। পরিশেষে তিনি শিরক ও বিদ'আত থেকে বেঁচে থেকে সুন্নাতী জীবন যাপনের আহবান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

(১৭) মাওলানা আব্দুল মান্নান
(সাতক্ষীরা)

হাম্দ ও ছানার পর **'মা'রেফাতে দ্বীন'** বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মা'রেফাতে দ্বীন হ'ল আল্লাহ্কে জানা, ইসলামকে জানা। কিন্তু তথাকথিত মা'রেফাতের ধ্বজাধারীরা কাশ্ফ ও ইলহামের দোহাই দিয়ে গগনচুম্বী কবর, ক্বিবলা, কা'বা, খানকাহ, দরগাহ তৈরী করে শিরক ও বিদ'আতের আখড়া তৈরী করেছে। তাদের মতে 'যত কাল্লা তত আল্লাহ' (নাউযুবিল্লাহ)। তারা সেই সব দরগাহ ও খানকায় গাউছ, কুতুবদের সুপারিশ লাভের আশায় ভক্তি গদগদচিত্তে গরু, ছাগল দান করে, মানত করে। যা প্রকাশ্য শিরক। তাদের মতে অলীদের একটি বিরাট সাম্রাজ্যের জাল বিস্তৃত রয়েছে। যার মাধ্যমে তারা সৃষ্টিকূল পরিচালনা করে থাকেন। তাদের মধ্যে একজন 'গাউছ', চারজন 'কুতুব', সাতজন 'আবদাল' ও প্রত্যেক শহরে একজন করে 'নাজীব' রয়েছেন। প্রতি রাত্রিতে হেরা গুহাতে এরা সমবেত হয়ে সৃষ্টিকূলের তাক্বদীর বা ভাগ্যলিপি পর্যালোচনা করেন।

তিনি বলেন, মা'রেফাতী পণ্ডিতরা 'আহমাদ' ও 'আহাদ'-এর মাঝে পার্থক্য করে না। ফলে নিজেই আল্লাহ দাবী করে বসে। যেমন বায়েযীদ বুস্তামী বলেছিলেন, طلبت الله ستين سنة فإذا أنا هو '৬০ বছর ধরে আমি আল্লাহ্কে খুঁজেছি। এখন দেখছি তিনি আমিই'। অনুরূপভাবে হুসাইন বিন মনছূর হাল্লাজ আল্লাহ ও নিজের সম্পর্কে বলেন, نحن روحان حللنا بدنا 'আমরা দু'টি রূহ একটি দেহে লীন হয়েছি'। আর এজন্যই তিনি নিজেকে 'আমিই সত্য' أنا الحق বা আল্লাহ বলেছিলেন। হিন্দু দার্শনিকগণ ঈশ্বর, মানুষ ও ব্যাঙের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে না পেয়ে বলেন, 'হরির উপরে হরি, হরি শোভা পায়। হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়'। একই দর্শনের প্রভাবে মুসলিম ছূফীগণ আহমাদ ও আহাদ-এর মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পান না। তারা বলেন,

'আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা;
'আহমাদ' 'আহাদ' হ'লে তবে যায় জানা।
মীমের ঐ পর্দাটিরে উঠিয়ে দেখরে মন,
দেখবি সেথায় বিরাজ করে 'আহাদ' নিরঞ্জন'।

বর্তমান বাংলাদেশী মা'রেফাতীরা উপরিউক্ত বিশ্বাস মানুষের মাঝে প্রচার করছে। তারা মানুষের কাছে থেকে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ লুটে নিচ্ছে। তাদের ধারণা মতে অলীগণ জীবিত থাকেন। তারা কখনও মরেন না। এ ধরনের আরো অনেক ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস তাদের মাঝে

প্রচলিত আছে।

দুর্ভাগ্য, এসব হতভাগ্যরা প্রকৃত মা'রেফাত বুঝে না। অথচ আল্লাহ্কে চেনাই প্রকৃত মা'রেফাত। একজন মুমিন যখন ছালাতে দাঁড়িয়ে যাবে, তখন যেন তিনি আল্লাহ্কে দেখছেন। আর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এভাবেই ছালাত আদায় করার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তথাকথিত মা'রেফতী ফকীরদের ছালাতের প্রয়োজন হয় না। তারা যুক্তি দেখায় আমরা কাউকে দেখায়ে ছালাত আদায় করি না। আমরা চুপি চুপি নিভৃতে ছালাত আদায় করি। এভাবে ধর্মের নামে শিরক ও বিদ'আতে দরগাহ ও খানকাহর সরগরম চলছে। আমাদেরকে এ ধরনের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হবে। তবেই আমরা প্রকৃত মুমিন হ'তে পারব।

(১৮) মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম (সাতক্ষীরা)

হাম্দ ও ছানার পর তিনি সূরা বাক্বারার ২০৮ নং আয়াতের আলোকে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ص وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّمُّبِيْنٌ –

'হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (বাক্বারাহ ২০৮)।

তিনি বলেন, ইসলাম একটা শান্তির ধর্ম। অথচ ইসলামের জন্য আমরা মোটেই ত্যাগ স্বীকার করি না। আমাদেরকে যাবতীয় অসৎ কাজ ত্যাগ করতে হবে। কারণ অসৎ কাজ করা শয়তানের কাজ। আর শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অতএব শয়তানের যাবতীয় প্ররোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

তিনি বরেন, ইসলাম থেকে বিমুখতাই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَه مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى – قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا –

'যে আমার স্মরণে বিমুখ, তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান' (ত্বা-হা ১২৪-১২৫)।

পরিশেষে তিনি শয়তানের কুপ্রতারণা থেকে বিরত থেকে সঠিকভাবে ইসলামের সুমহান আদর্শে টিকে থাকার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য **শেষ করেন।**

জুম'আর খুৎবা

(আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ)

ইজতেমার ১ম দিন ১৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার জুম'আর খুৎবায় মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ **'দুনিয়া ভালবাসার বস্তু নয়'** শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, দুনিয়াকে আমরা যতটুকু ভালবাসছি, দুনিয়া ততটুকু ভালবাসা পাবার যোগ্য নয়। কেননা দুনিয়া অতীব ক্ষণস্থায়ী জায়গা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا– وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى – 'বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী' (আ'লা ১৬-১৭)।

উক্ত আয়াতে পার্থিব জীবনের মূল্যায়ন না করে পারলৌকিক জীবনকে সর্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পার্থিব জীবনকে নিন্দা করে বলেন, اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ، حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ– 'প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও' (তাকা-ছুর ১-২)। মানুষের পার্থিব জগতের লোভ-লালসা কবরে যাওয়া পর্যন্ত থাকবে। যখন মানুষ কবরে পৌঁছে যাবে, তখন সে বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াবী জীবনকে ভালবাসার কতটুকু মূল্য। কিন্তু তখন তা বুঝে কোন লাভ হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى – 'সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে'? (ফাজর ২৩)।

পার্থিব জগতকে যারা না বুঝে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসে তাদের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ – ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ – كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ – لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ – 'এটা কখনও উচিত নয়, তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়, তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে' (তাকা-ছুর ৩-৬)।

পার্থিব জগতের মূল্য সম্পর্কে একটি হাদীছে বলা হয়েছে,

وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَه فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ–

'হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ্র

কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ'ল, যেমন তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি অঙ্গুলী ডুবায়ে দেয়, এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক উহা কি পরিমাণ পানি নিয়ে আসল' *(মুসলিম, মিশকাত-আলবানী, 'কিতাবুর রিক্বাক্ব' হা/৫১৫৬)*।

এ সম্পর্কে আর একটি হাদীছে বলা হয়েছে,

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هٰذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ فَقَالُوْا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ قَالَ فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ-

'হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) একটা কানকাটা মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে ইহাকে এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে পসন্দ করবে? তারা বলল, আমরা তো ইহাকে কোন কিছুর বিনিময়েই নিতে পসন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! ইহা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট, আল্লাহ্র কাঁছে দুনিয়া (এবং উহার সম্পদ) এর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট' *(মুসলিম, মিশকাত-আলবানী হা/৫১৫৭)*।

উক্ত হাদীছ থেকে পার্থিব জীবনের মূল্যহীনতার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত মেলে বৈকি। আমাদের ভাবা দরকার, একজন বেশ্যা আর একজন দরবেশ কিভাবে এ দুনিয়াতে খেতে পাচ্ছে। সুতরাং এ দুনিয়ার কোন মূল্য নেই, বরং আল্লাহ প্রত্যেকের আমল দেখেন।

অপর একটি হাদীছে বলা হয়েছে,

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِيْ مَالِيْ وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ-

'হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বান্দা বলে যে, 'আমার মাল' 'আমার মাল'। প্রকৃতপক্ষে তার মাল হ'তে তার (উপকারে আসে) মাত্র তিনটি। যা খেয়ে সে শেষ করে দিয়েছে বা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছে অথবা দান করে (পরকালের জন্য) সংরক্ষণ করেছে। এতদ্ভিন্ন যা আছে তা তার কাজে আসবে না এবং সে লোকদের (ওয়ারিছদের) জন্য ছেড়ে চলে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৬)*।

তিনি বলেন, পার্থিব মোহে যারা জড়িয়ে পড়ে তাদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ পা না ভিজায়ে পানিতে চলতে পারে কি? তারা বলল, না (ইহা কখনও সম্ভব নহে) হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তখন তিনি বললেন, অনুরূপভাবে কোন দুনিয়াদার গোনাহ হ'তে নিরাপদে থাকতে পারে না' *(বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৫২০৫)*।

মহানবী (ছাঃ) বলেন,

فَوَاللهِ لاَالْفَقْرَ أَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ أَخْشٰى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ-

'আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে দরিদ্রতার ভয় করি না; কিন্তু আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে যেমনি প্রশস্ত করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। আর তোমরা উহা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করবে যেরূপ প্রতিযোগিতা তারা করেছিল। ফলে উহা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-আলবানী হা/৫১৬৩)*।

পার্থিব জগতকে নিন্দা করে মহানবী (ছাঃ) বলেন,

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَّا سَقٰى كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةً-

'যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মাছির একটি পাখার সমমূল্য পরিমাণ হ'ত, তাহ'লে তিনি কোন কাফেরকে এক ঢোকও পানি পান করাতেন না' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত-আলবানী হা/৫১৭৭)*।

তিনি বলেন, পার্থিব জগতের মোহে পড়ে যারা আল্লাহ্কে ভুলে যায় তাদের পরিণতি সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে,

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لاَّ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ-

'হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে লও। আমি তোমার অন্তরকে অভাব মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দেব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে (পার্থিব) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মিটাব না' *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত-আলবানী হা/৫১৭২)*।

[সমাপ্ত]

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/১৮১)ঃ ছেলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে আযান দিতে হয়, আর মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে আযান দিতে হয় না। এরূপ বিধান শরীয়তে আছে কি?

-আবদুল হাদী
সাং- নলছিয়া, জুমারবাড়ী
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছেলে হৌক মেয়ে হৌক ভূমিষ্ঠ সন্তানের কানে আযান শুনাতে হয় *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইরওয়া হা/১১৭৩, ৪/৪০০ পৃঃ)*। তবে ডান কানে আযান ও বাম কানে একামত শুনানোর হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(ঐ, হা/১১৭৪)*।

প্রশ্ন (২/১৮২)ঃ মসজিদে আগুন অথবা আগরবাতি জ্বালানো যায় কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-ইসহাক্ব আলী
খয়রাবাদ, গোমস্তাপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যে কোন মাধ্যমে মসজিদ আলোকিত করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার ছালাত অবস্থায় আমার সামনে আগুন পেশ করা হয়েছিল' *(বুখারী ১/৬১, ফৎহুলবারী হা/৪৩১; 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল এমতাবস্থায় যে তার সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড বা আগুন বা এমন কোন বস্তু যাকে উপাসনা করা হয়, অতঃপর উক্ত ছালাতের মাধ্যমে সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে' অনুচ্ছেদ নং ৫১)*। আর আগরবাতি অথবা যে কোন মাধ্যমে মসজিদ সুগন্ধিময় করে রাখা সুন্নাত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) মহল্লায় মহল্লায় (ওয়াক্তিয়া) মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ করেছেন এবং মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ও সুগন্ধিময় করতে আদেশ করেছেন' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৭১৭)*।

প্রশ্ন (৩/১৮৩)ঃ আমাদের গ্রামে খুব সরল মনের একজন লোক আছে। কিন্তু তার স্ত্রী খুব বদমেযাজী। সে তার স্বামীকে যখন তখন গালিগালাজ করে। কাফেরও বলে। অথচ লোকটা ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত। এর কারণ হ'ল- ঐ লোকের যা জমি ছিল তার স্ত্রীর নামে সব লিখে দিয়েছে। ফলে তার স্ত্রী তাকে কোন মূল্যায়ণ করে না। আর সেও ভয়ে কিছু বলে না। এই পরিস্থিতিতে ঐ ব্যক্তির ঘর-সংসার করা কি ঠিক হবে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আবদুল ক্বাদের
সাথিয়া, পাবনা।

উত্তরঃ এধরনের ঘটনার জন্য স্বামীই দায়ী। ভালবাসার খাতিরে নিজের সম্পদ স্ত্রীর নামে পুরোটা লিখে দেওয়া শরীয়ত বিরোধী কাজ। যার শাস্তি তাকে দুনিয়াতেই ভোগ করতে হচ্ছে। ওয়ারেছ যারা থাকবে তারাও তার সম্পদ হ'তে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আখেরাতেও তাকে জওয়াবদিহী করতে হবে। যে সমাজে এই লোক বসবাস করছে সেই সমাজের উচিৎ তার স্ত্রীকে বুঝানো যে, স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে হবে, গালিগালাজ করা অন্যায়। স্বামী যদি কাফের না হয়, তাকে কাফের বললে নিজেই কাফের হয়ে যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১৪, ৪৮১৫)*।

এরপরও স্ত্রী যদি এ ধরনের আচরণ করতে থাকে তাহ'লে তাকে তালাক দেওয়া উচিৎ *(বাক্বারাহ ২২৯)*।

প্রশ্ন (৪/১৮৪)ঃ কোন পুরুষ যদি কোন নারীকে ধর্ষণ করে, তাহ'লে তাদের উভয়ের শাস্তি কি যেনার শাস্তি হবে?

-ত্বা-হা
২৪/৮/২-২য় কলোনী
মাজার রোড, ঢাকা।

উত্তরঃ ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ) মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং পুরুষটিকে যেনার শাস্তি প্রদান করেছিলেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৭১)*।

ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে একজন মহিলা ছালাত আদায়ের জন্য বের হয়েছিল। একটি লোক তাকে পেয়ে কাপড়ে ঢেকে নেয় এবং তাকে ধর্ষণ করে। মহিলাটি চিৎকার শুরু করলে লোকটি চলে যায়। কিন্তু সেখান দিয়ে মুহাজেরীনদের একদল লোক যাচ্ছিল। মহিলাটি তাদেরকে বলে দিল যে, ঐ ব্যক্তি আমার সাথে এই আচরণ করেছে। লোকেরা তাকে ধরে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসল। রাসূল (ছাঃ) মহিলাটিকে বললেন, তুমি চলে যাও। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন! আর পুরুষটিকে 'রজম' করার আদেশ দিলেন' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩৫৭২)*।

প্রশ্ন (৫/১৮৫)ঃ ছহীহ হাদীছের আলোকে কবর যিয়ারত করার নিয়ম জানতে চাই। কবরস্থানে গেলে অনেকেই লুঙ্গীর নিচে গিট দেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আবদুল জাব্বার
গ্রাম- গোলনা, পোঃ- সাজিয়াড়া
ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ রাতে হৌক অথবা দিনে হৌক একা একা কবর যিয়ারত করা এবং কবরবাসীর জন্য একাকী হাত তুলে দো'আ করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাক্বী গোরস্থানে গিয়ে রাতের বেলা একাকী দু'হাত তুলে তাদের জন্য নিম্নোক্ত ভাষায় দো'আ করেছিলেন- اَلسَّلاَمُ عَلَى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ-

'মুমিন-মুসলমান কবরবাসীর উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! আর আমাদের মধ্যে যারা আগে মারা গেছেন, তাদের উপর আল্লাহ করুণা বর্ষণ করুন এবং যারা পরে মারা যাবেন, তাদের উপরও। নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব' *(মুসলিম, ১ম খণ্ড, 'কিতাবুল জানায়েয' ৩১৪ পৃঃ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি প্রমাণিত হয়। লুঙ্গীর নীচে গিট দিয়ে কবরস্থানে যাওয়া শরীয়ত বহির্ভূত কর্ম।

প্রশ্ন (৬/১৮৬)ঃ আযানের সময় কুরআন-হাদীছের আলোচনা করা যায় কি?

-মুনীরুযযামান
কামালনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আযানের সময় কুরআন-হাদীছের আলোচনা নিষেধের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি অন্য কোন কথা বলা নিষেধেরও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং আযানের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর কথা বলার প্রমাণ পাওয়া যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) ফজরের সময় শত্রুদের উপর হামলা করতেন। তিনি প্রথমে আযান শুনার চেষ্টা করতেন। যদি তিনি আযান শুনতেন, তাহ'লে হামলা করা হ'তে বিরত থাকতেন। আর আযান না শুনলে হামলা করতেন। হঠাৎ তিনি এক লোককে বলতে শুনলেন, *আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার*। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে গেলে। তারপর তারা লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখল যে, লোকটি ছাগলের রাখাল' *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৬৫)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আযানের মধ্যে কথা বলা যায়। তবে অবশ্যই প্রত্যেক শ্রোতাকে আযানের উত্তর দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন মুয়ায্যিন যা বলে তোমরাও তা বল' *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৬৪)*।

প্রশ্ন (৭/১৮৭)ঃ পেশাব-পায়খানায় পানি ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করা যাবে কি? এবং ওযূর অবশিষ্ট পানি পেশাব-পায়খানায় ব্যবহার করা যাবে কি?

-মনীর
যুগীপাড়া
লক্ষণহাটি, নাটোর।

উত্তরঃ পেশাব-পায়খানায় পানি ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করা যায় এবং ওযূর অবশিষ্ট পানিও পেশাব-পায়খানায় ব্যবহার করা যায়। কারণ পেশাব-পায়খানায় পানি ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট পানির যেমন মর্যাদা কমে যায় না, তেমনি পানি দ্বারা ওযূ করলে অবশিষ্ট পানির মর্যাদাও বেড়ে যায় না। বদ্ধ পানি বা পাত্রের পানি শুধুমাত্র ঐ সময়ে অপবিত্র হয় যখন তাতে কোন অপবিত্র বস্তু পড়ে এবং পানির স্বাদ, রং ও গন্ধ পরিবর্তিত হয়ে যায় *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৫)*।

প্রশ্ন (৮/১৮৮)ঃ ছালাতের মধ্যে থুথু ফেলা যাবে কি? কুরআন-হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহিল কাফী
যুগীপাড়া, লক্ষণহাটী
নাটোর।

উত্তরঃ ছালাতে থুথু ফেলার প্রয়োজন হ'লে বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে ফেলতে পারে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছালাতে থাকে, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলে। কাজেই অবশ্যই সে যেন সামনে ও ডান দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে। তবে বামদিকে পায়ের নিচে নিক্ষেপ করতে পারে' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২৪২)*।

প্রশ্ন (৯/১৮৯)ঃ 'সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে একবার কুরআন খতম করার সমান নেকী হয়' এই হাদীছের সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল জাব্বার
এস,পি,এম,ডি, বাজার
দিনাজপুর।

উত্তরঃ 'সূরা ইখলাছ'কে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ এবং 'সূরা কাফিরূন'কে এক চতুর্থাংশ বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেকের

সমান। সূরা ইখলাছ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান এবং সূরা কাফিরূন কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৫৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে এক বার কুরআন খতম করার সমান নেকী পাওয়া যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই বাণী সূরা ইখলাছ বা কাফিরূনের মর্যাদা বর্ণনা করে মাত্র। অবশ্যই কুরআন খতমের ভিন্ন মর্যাদা এবং অফুরন্ত নেকী রয়েছে। আর এই হাদীছে যে সূরা যিলযালের মর্যাদার কথা রয়েছে তা যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৫৫০)*। অতএব সূরা যিলযাল দু'বার পড়লে কুরআন খতমের নেকী পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (১০/১৯০)ঃ আগে আমি কুরআন পড়তে পারতাম। কিন্তু আমার অসুস্থতার কারণে এখন আর কুরআন পড়তে পারি না। অন্যকে দিয়ে কুরআন পড়ালে আমার নেকী হবে কি?

-ইসহাক্ব
গোমস্তাপুর, রহনপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ একজন কুরআন পড়লে অন্যজন নেকী পাবে এ কথা সঠিক নয়। বরং যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে, শুধুমাত্র তারই নেকী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মানুষের জন্য অতটুকুই প্রাপ্য, যতটুকুর জন্য সে চেষ্টা করে' (নাজম ৩৯)। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের কোন একটি অক্ষর পড়বে, তার কারণে তার জন্য নেকী রয়েছে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩৭)*। অত্র আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন কুরআন পড়লে অন্যজনের নেকী হবে না। বরং পাঠকারীর-ই নেকী হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এমন কিছু নেকীর কাজ রয়েছে যা একজন পালন করে অন্যজনকে নেকী পৌঁছাতে পারে। যেমন- (১) হজ্জ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১২)* (২) ছাদাক্বা বা দান *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০)* (৩) দো'আ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)* (৪) কারো পক্ষ থেকে মানতের ছিয়াম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৩)*। তবে ছালাত আদায় করে এবং কুরআন পড়ে অন্যজনকে নেকী পৌঁছানোর কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

প্রশ্ন (১১/১৯১)ঃ বড়দের যদি কোন ভুল দেখি কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখি, সে সময় সত্য কথা বলে বাধা দেওয়া যাবে কি? আর যদি সত্য কথা বলাতে আঘাত পায়, তাহ'লে তার উপর দোষ বর্তাবে কি?

-খালেদা
লস্করখোলা, নাটোর।

উত্তরঃ বড়দের ভুল দেখলে কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করতে দেখলে শালীনতা বজায় রেখে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে এবং সাধ্যমত মিথ্যার প্রতিকার করতে হবে। তাতে তিনি আঘাত পেলে তাঁর উপর কোন দোষ বর্তাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা মানুষকে ভয় কর না আমাকে ভয় কর' (মায়েদা ৪৪)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ যখন অন্যায় লক্ষ্য করে তার প্রতিকার করে না, তখন আল্লাহ তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন' *(ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অবশ্যই কোন ব্যক্তি যেন হক্ব কথা বলতে মানুষকে ভয় না করে যখন সে হক্ব জানতে পারবে *(ইবনে মাজাহ হা/৩২৫৩ হাদীছ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হচ্ছে অন্যায়কারী নেতার নিকট হক্ব কথা বলা' *(ইবনে মাজাহ হা/৩২৫৬ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১২/১৯২)ঃ বর্তমানে আমাদের তিনজন সন্তান রয়েছে। আমাদের আয় কম। এমতাবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আয়েশা
যুগীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ সুখী সংসারের উদ্দেশ্যে অথবা আয় কম থাকার কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'দরিদ্র্যতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করনা। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই খাদ্য প্রদান করে থাকি। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ' (ইসরা ৩১)। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা খাদ্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করোনা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৩/১৯৩)ঃ মুহাররমের ছিয়াম কি হযরত হুসাইন বিন আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের কারণেই রাখা হয়? সেই ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-তরীকুল ইসলাম
সাং- বেনীপুর, ভগবানগোলা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ মুহাররমের ছিয়াম হযরত হুসাইন বিন আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের কারণে রাখা হয় না। রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই মুহাররমের ছিয়াম পালন করেছেন। অপরদিকে হযরত হুসাইন বিন আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে শাহাদত করেছেন। তাহ'লে কি করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের কারণে এই ছিয়াম পালন করলেন? অতএব এসব ভিত্তিহীন কথা মাত্র।

মুহাররম মাসের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। আর সে কারণেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম পালন করেছেন এবং পালন করার নির্দেশও দিয়েছেন। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন আশূরার ছিয়াম পালন করলেন এবং ছাহাবীদেরকে উহা পালন করার নির্দেশ দিলেন, তখন ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এই দিনকে তো ইয়াহুদ-নাছারাগণ সম্মান করে থাকে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যদি আমি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহ'লে নিশ্চয়ই নবম তারিখেও ছিয়াম পালন করব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪১)*। সে কারণেই উম্মতে মুহাম্মাদী ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ মুহাররম ছিয়াম পালন করে থাকে।

এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'রামাযানের ছিয়ামের পর মুহাররমের ছিয়ামই হ'ল শ্রেষ্ঠ ছিয়াম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯)*। অন্য হাদীছে আছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকটে আমার আশা যে, আশূরার ছিয়াম পালন করলে পরবর্তী এক বছরের গোনাহ মাফ করে দিবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০২৪)*।

প্রশ্ন (১৪/১৯৪)ঃ জনৈক ছেলে তার পিতার হাতে হাত দিয়ে অঙ্গীকার করেছিল যে, সে ছাত্র জীবনে বিবাহ করবে না। পরবর্তীতে সেই ছেলে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তার পিতার অনুমতি ছাড়াই 'কোর্ট ম্যারেজ' করে। একথা শুনে তার পিতা বলে যে, আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত ঐ ছেলেকে বাড়ীতে উঠতে দিব না এবং তার লেখা-পড়ার কোন খরচও দিব না। এই পরিস্থিতিতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ছেলেটি পিতার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে এবং বলছে, আমি কিছুই চাই না শুধু ক্ষমা চাই। অন্যথায় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না। শরীয়তের দৃষ্টিতে তার বিবাহ হয়েছে কি-না? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
খেসবা, নাচোল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলের কোন 'অলী' (অভিভাবক) শর্ত নয়। তবে মেয়ের জন্য 'অলী' অবশ্যই শর্ত। অন্যথায় বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে *(আহমাদ, আবুদাউদ ও অন্যান্য, মিশকাত হা/৩১৩০, ৩১৩১)*।

প্রশ্নানুযায়ী ছেলের বিবাহ হয়ে গেছে। পিতা-মাতাকে অবশ্যই ছেলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ছেলে যখন ভুল বুঝে পিতার কাছে ক্ষমা চাইবে, তখন যোগ্য পিতা হ'লে অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতার সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে (তাদের জন্য জান্নাত তৈরী করা হয়েছে)। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ১৩৪)*।

সুতরাং বিবাহ যেহেতু শরীয়ত অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে সেহেতু পিতা স্বীয় পুত্রকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ছেলে ও বউমাকে ঘরে তুলে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

প্রশ্ন (১৫/১৯৫)ঃ কোন লোক যদি তালাকের নিয়তে অস্থায়ী ভাবে কোন নারীকে বিবাহ করে, তাহ'লে কি এ বিবাহ জায়েয হবে? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দিবেন।

-আহসান হাবীব
আলবাহা, সঊদী আরব।

উত্তরঃ এধরনের বিবাহকে শরীয়তের ভাষায় বলা হয় نِكَاحُ الْمُتْعَةِ। অর্থাৎ অস্থায়ী বিবাহ। এধরনের বিবাহ মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত জায়েয ছিল। পরে রাসূল (ছাঃ) মুত'আ বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ করে দেন *(বুখারী, মুসলিম, যাদুল মা'আদ ৩য় খণ্ড ৪৬০ পৃঃ)*। অনেকেই ইবনে আব্বাসের ফৎওয়ার উপর ভিত্তি করে এধরনের বিবাহকে জায়েয মনে করেন। কিন্তু ইবনু আব্বাস স্বীয় ফৎওয়া প্রত্যাহার করেছেন *(দেখুন- ঐ, পৃঃ ৪৬১)*। সুতরাং তালাকের নিয়তে অস্থায়ী বিবাহ জায়েয নয়।

প্রশ্ন (১৬/১৯৬)ঃ আল্লাহ্র ছিফাত (গুণ) সমূহের মধ্যে কিভাবে শিরক হয় উদাহরণ সহ জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নওশের আলী
সাং+পোঃ শিবপুর,
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ্র যাতের সাথে শিরক করার মতই আল্লাহ্র ছিফাতের সাথেও কিছু লোক শিরক করে থাকে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা আলেমুল গায়েব। অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই রয়েছে। সব জিনিষকে সব জায়গায় সব সময় তিনি জানেন। অথচ অনেকে আল্লাহ

ছাড়াও অন্যদের সম্পর্কে এ ধারণা করে নিয়েছে যে, তিনিও সব কথা জানেন। যেমন মুরীদ তার পীর সম্পর্কে এরকম ধারণা করে থাকে। কেউ কেউ নবী, অলী, শহীদকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করে থাকে এবং বলে যে, এরা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। বিপদে পড়ে ডাকলে শুনে থাকেন এবং সাহায্য করেন। তার নামে নযর-নিয়ায করলে তিনি জেনে যান এবং খুশি হয়ে আরও দেন ইত্যাদি। এরূপ ধারণা পোষণ করা আল্লাহ্র ছিফাত তথা গুণাবলীর সাথে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (১৭/১৯৭)ঃ আমি বেশ কিছুদিন হ'তে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' পরিচালিত মহিলা বৈঠকে যাই। অতঃপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে আরম্ভ করি। আমার স্বামী আগে থেকেই ছালাতে অভ্যস্ত। তিনি ধনিক শ্রেণীর লোক। আমাদের পাশে অনেক গরীব মানুষ আছে। আমি তাকে পার্শ্ববর্তী গরীবদের দান করতে বলি। কিন্তু তিনি খুব কৃপণ। কিছুই দান করতে চান না। কৃপণতা করা কি জায়েয? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কৃপণতা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। শরীয়তে ইহা জায়েয নয়। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যুলম হ'তে বেঁচে থাকবে, কেননা যুলম হবে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকার স্বরূপ এবং কৃপণতা হ'তে বেঁচে থাকবে। কেননা কৃপণতা ধ্বংস করেছে তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে। কৃপণতা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে রক্তপাতের প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি (ফলে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংস হয়েছে)' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬৫)*।

সুতরাং উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কৃপণতা করা জায়েয নয় বরং ইহা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

প্রশ্ন (১৮/১৯৮)ঃ মওযূ বা জাল হাদীছ কি করে প্রমাণ করবেন? যেমন জনৈক বক্তা বললেন, مَنْ زَارَ قَبْرِىْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ رواه البزار 'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজেব হয়ে যাবে' (বাযযার)। উক্ত হাদীছটি জাল বা মওযূ প্রমাণ করুন!

-মুহাম্মাদ মহসিন আলী
ইসলামকাঠি, তালা
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হাদীছ যাচাই-বাছাই করার মাপকাঠি হ'ল সনদ বা বর্ণনা সূত্র। উল্লেখিত হাদীছটির সনদ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে-

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ -

উক্ত বর্ণনাটি হাদীছ শাস্ত্রের মুহাদ্দিছগণের নিকট শুধু যঈফই নয় বরং মউযূ। এই রেওয়ায়াতের সনদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম রয়েছেন, যিনি আবু ওমর আল-গেফারীর ছেলে। তিনি মুনকার। মুহাদ্দিছগণ তাকে মিথ্যাবাদী অথবা মিথ্যা রেওয়ায়াত আবিষ্কারকারী বলেছেন। ইমাম আবুদাঊদ বলেছেন, এ ব্যক্তি মুনকারুল হাদীছ অর্থাৎ তার হাদীছ অস্বীকৃত। ইমাম হাকেম বলেন, আব্দুল্লাহ ছেক্বাহ রাবীদের নাম নিয়ে মনগড়া রেওয়ায়াত বর্ণনা করে থাকে। স্বয়ং ইমাম বায্যার এই রেওয়ায়াত বর্ণনা করার পর লেখেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ইবরাহীমের এই রেওয়ায়াত এবং তার অন্যান্য রেওয়ায়াতগুলো অন্য কোন মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেননি *(মীযানুল ই'তেদাল ২য় খণ্ড ২০-২১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৯/১৯৯)ঃ পেপার-পত্রিকায় অদ্ভুত ঘটনা দেখা যায়। যেমন এক মহিলার ৮ জন সন্তান প্রসব করেছে। এধরনের ঘটনা কি সত্য? আর এটা কি সম্ভব?

-তসলীমা নাসরীন
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ এগুলো বাস্তব ঘটনা। আট কেন আরও অধিকও হ'তে পারে। এটি হওয়ার কারণ হ'ল, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় স্ত্রীর ডিম্বকোষগুলি চলাচল করে। স্বামীর বীর্যের মধ্যে লক্ষাধিক শুক্রকীট থাকে। চিরাচরিত নিয়ম হ'ল যে কোন একটি শুক্রকীট স্ত্রীর ডিম্বকোষে প্রবেশ করলে সেটি বন্দ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছায় যদি সেই সময় একাধিক শুক্রকীট এক সাথে ঢুকে যায়। তবে একাধিক সন্তান-সন্ততিই জন্ম নেয়। যার ফলে অনেক মহিলা একাধিক সন্তান প্রসব করেন।

প্রশ্ন (২০/২০০)ঃ আমাদের পাশেই 'আশেকে রাসূল' নামে একটি গোষ্ঠী আছে। যাদের অনেকেই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে না। তাদের কাজ সব সময় মীলাদ মাহফিল ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকা। এরা

ছহীহ হাদীছের ধারে কাছেও যায় না। শরীয়তের দৃষ্টিতে এদের হুকুম কি?

-খলীলুর রহমান
বংশাল, পুরাতন ঢাকা।

উত্তরঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত হ'ল ফরয। যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আর মীলাদ হ'ল বিদ'আত। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর প্রায় ছয়শো বছর পরে ৬০৫ অথবা ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের এরবল এলাকার গভর্ণর কুকুবুরী কর্তৃক সৃষ্ট। ছালাত আদায়ের ফলে জান্নাত লাভ হয়। আর বিদ'আত করার পরিণাম হ'ল জাহান্নাম (নাসাঈ হা/১৫৭৯)। এক্ষণে যারা ছালাত বাদ দিয়ে মীলাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা 'আশেকে রাসূল' নয়। বরং 'আশেকে বিদ'আত'। প্রকৃত মুমিনকে এসব বিদ'আতী হ'তে সর্বদা দূরে থাকা এবং তাদেরকে কোনরূপ সম্মান না করাই শরীয়তের হুকুম (বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৮৯)।

এরা যতদিন বিদ'আত করতে থাকবে, ততদিন সেই পরিমাণ সুন্নাত তাদের কাছ থেকে লোপ পেতে থাকবে। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না' *(দারেমী সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৮৮)*।

প্রশ্ন (২১/২০১)ঃ অনেক আলেমকে দেখা যায় যে, তাফসীর মাহফিল বা বিভিন্ন জালসায় জেনে-শুনে জাল হাদীছ বলে থাকেন। তাদের হুকুম কি? জাল হাদীছ তৈরীকারীর ন্যায় তাদেরও কি একই হুকুম হবে?

-হাশমতুল্লাহ
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ জাল হাদীছ তৈরীকারীর পরিণতি যেমন জাহান্নাম, তেমনি জেনে-শুনে যদি কোন আলেম জাল হাদীছ বলেন, তারও পরিণতি অনুরূপ হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,..... যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে *(অর্থাৎ বলবে যে, আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন বা করেছেন অথচ তিনি বলেননি বা করেননি)* সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হ'তে এমন কথা বলে, যা সম্পর্কে সে মনে করে যে, উহা মিথ্যা। সে মিথ্যুকদের একজন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯)*। মির'আত গ্রন্থকার বলেন, 'সে জাল হাদীছ তৈরীকারীর একজন' *(মির'আতুল মাফাতীহ ১ম খণ্ড ৩০৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২২/২০২)ঃ সফরে যোহর ও আছর ছালাত জমা' করা যাবে কি? এক সফরে আমরা এরূপ করলে আমাদের সাথী কিছু হানাফী ছাত্রভাই শুধু যোহর পড়ল এবং বলল যে, এধরনের কোন হাদীছ নেই। এর সত্যতা জানতে চাই এবং জমা' তাক্বদীম (আগে জমা করা) ও জমা' তাখীর (পরে জমা করা) জায়েয কি-না? ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুফাযযল হোসাইন
প্রেমতলী, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ সফর অবস্থায় জমা' তাক্বদীম ও তাখীর করে ক্বছর ছালাত আদায় করা সম্পর্কে বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) তাবুক যুদ্ধে মনযিল ত্যাগের পূর্বে সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আছর-এর ছালাত একত্রে পড়তেন। যদি সূর্য ঢলার পূর্বে প্রস্থান করতেন তখন যোহরকে বিলম্ব করে যোহর ও আছর একত্রে পড়তেন। মাগরিবেও তিনি এরূপ করতেন। অর্থাৎ যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে প্রস্থান করতেন, তখন মাগরিব ও এশাকে জমা' (একত্র) করতেন। আর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে প্রস্থান করতেন, তখন মাগরিবকে বিলম্ব করে মাগরিব ও এশা একত্র করে পড়তেন' *(আবুদাঊদ হা/১২২০; তিরমিযী হা/৫৫৪; হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৪৪; ইরওয়াউল গালীল ৩য় খণ্ড ২৮ পৃঃ)*। সুতরাং জমা' তাক্বদীম ও তাখীর উভয়ই জায়েয।

প্রশ্ন (২৩/২০৩)ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক কোন দো'আটি পড়তে হবে এবং দো'আ পড়ার পদ্ধতি কিরূপ হবে? দো'আটি উচ্চারণ সহ আত-তাহরীকে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

-ইবরাহীম
নন্দলালপুর
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার একাধিক দো'আ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দো'আটি নিম্নরূপ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে কারো অসুখ হ'লে রাসূল (ছাঃ) নিজের ডান হাতে তাকে স্পর্শ করে বলতেন, أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণঃ *আযহিবিল বা'সা রব্বান্না-সে ওয়াশফে আনতাশ শা-ফী লাশিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আল্লা ইউগা-দেরু সাক্বামা।*

অর্থঃ 'হে মানুষের প্রভু! এই কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর তাকে। তুমিই আরোগ্য দানকারী। তোমার

আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য যা বাকী রাখেনা কোন অসুস্থতাকে' *(বুখারী ও মুসলিম মিশকাত হা/১৫৩০)*।

প্রশ্ন (২৪/২০৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি একদিকে হজ্জ করে হাজী ছাহেব বনেছেন, অপরদিকে গান-বাজনা ক্লাবের সভাপতিও হয়েছেন। এই দ্বি-মুখী নীতি ইসলামে বৈধ কি?

-আবদুর রহমান
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ভাল-মন্দ একত্রিত করা ইসলাম বিরোধী কাজ। গান-বাজনা নিঃসন্দেহে হারাম। যা শয়তানের হাতিয়ার এবং মানুষের চরিত্র ধ্বংসের অন্যতম মাধ্যম। এই অন্যায় কাজের দায়-দায়িত্ব সেই সভাপতির উপরে বর্তাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমরা তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে...' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। অন্য এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন তোমরা সবচেয়ে খারাপ লোক ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে দ্বি-মুখী (কপট)। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে যায় এবং অপর মুখ নিয়ে অন্যদের কাছে যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২২)*।

সুতরাং উল্লেখিত হাদীছের আলোকে দ্বি-মুখী নীতি ইসলামে জায়েয নয়। এটি নিকৃষ্ট কাজ। সুতরাং অন্যায় কাজ পরিহার করে দ্রুত তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসা দরকার।

প্রশ্ন (২৫/২০৫)ঃ কবরস্থানের জন্য ক্রয়কৃত জমিতে ঈদের মাঠ করা যায় কি?

-আবদুস সাত্তার সরকার
গ্রাম- কানসোনা, পোঃ- উল্লাপাড়া
যেলা- সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ কবরস্থানের জন্য ক্রয়কৃত জমিতে ঈদগাহ মাঠ করা যায়। যদি সেখানে কবর না থাকে এবং কবর স্থানের প্রয়োজন না থাকে। তবে কমিটিকে ঈদগাহের নামে ঐ মাটি ওয়াক্‌ফ করতে হবে। আর যদি কবরস্থানের প্রয়োজন থাকে, তাহ'লে কবরস্থানের নামে রাখাই উচিত হবে। ইচ্ছা করলে জনগণ উক্ত কবরস্থানের মাটিতে অস্থায়ীভাবে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার জন্য সম্পূর্ণ পৃথিবীকে সিজদার স্থান করা হয়েছে এবং পবিত্র করা হয়েছে' *(বুখারী ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৬/২০৬)ঃ কুরআন শরীফ পড়ার পূর্বে কি কি দো'আ পড়তে হয়? টেবিলের উপর কুরআন রেখে টেবিলে পা স্পর্শ করা যায় কি? পায়ের সমতলে কুরআন রেখে পড়া যায় কি? কুরআনের উপর অন্য কোন বই রাখা যায় কি?

-মুহাম্মাদ আযীযুল্লাহ
বালিয়াডাঙ্গা, হঠাৎগঞ্জ
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কুরআন পড়ার পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ' পড়তে হয় (নাহল ৯৮)। টেবিলের উপর কুরআন রেখে টেবিলে পা স্পর্শ করা, পায়ের সমতলে কুরআন রেখে পড়া এবং কুরআনের উপর অন্য বিষয়ের বই রাখা যদি কুরআনকে তাচ্ছিল্য করার জন্য হয়, তাহ'লে অবশ্যই তা হারাম হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কুরআন হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ' (যুরূজ ২১)। কুরআন মজীদ নিয়ে শত্রুদের এলাকায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৯৭)*। অতএব কুরআনের সাধ্যমত এর মর্যাদা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তবে মর্যাদা প্রদানের অর্থ এই নয় যে, চুমা দিতে হবে বা সালাম দিতে হবে।

প্রশ্ন (২৭/২০৭)ঃ পানি যেমন বাষ্প হয়ে উড়ে যায় তেমন পায়খানার রস ও পেশাবও বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। আর এ বাষ্প মানুষের পোশাকেও লাগে। তাহ'লে কি এ বাষ্পে কাপড় অপবিত্র হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইবনে হাকীম
সোনাপাতিল, নাটোর।

উত্তরঃ পেশাব-পায়খানার বাষ্প কাপড়ে লাগলে কাপড় অপবিত্র হবে না। কারণ এ বাষ্প থেকে বেঁচে থাকার উপায় মানুষের নেই। আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

প্রশ্ন (২৮/২০৮)ঃ ৫ দিন ই'তেকাফ করার পর যদি হায়েয হয়, তবে বাকি দিনগুলোতে কি ই'তেকাফের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বসে যিকির করা যাবে?

-বর্ণা
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ই'তেকাফ চলাকালীন সময়ে কোন নারী ঋতুবতী হ'লে তার নির্ধারিত স্থানে বসে আল্লাহ্‌র যিকির করতে পারে। ঋতুবতী নারীদের জন্য শুধুমাত্র ছালাত, ছিয়াম ও ত্বাওয়াফ করা নিষেধ। এতদ্ব্যতীত তারা সকল ইবাদত করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একমাত্র হজ্জ-এর উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে মদীনা থেকে বের হ'লাম। 'সারেফ' নামক স্থানে এসে আমার ঋতু হ'লে আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় নবী (ছাঃ) আমার নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কেন কাঁদছ? আমি বললাম, যদি এ বছর হজ্জ-এর নিয়ত না করতাম তাহ'লে ভাল হ'ত। তিনি বললেন, ... 'আল্লাহ তা'আলা আদমের কন্যাদের উপর এটা নির্ধারিত করেছেন। কাজেই ত্বাওয়াফ ব্যতীত হজ্জ-এর অন্যান্য বিধান পালন কর। যতক্ষণ না পবিত্র হও' *(বুখারী ১ম খণ্ড 'কিতাবুল হায়েয')*। অন্য

এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) ঋতুবতী নারীদেরকে ছালাত ও ছিয়াম পালন না করার কথা বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯)*।

অত্র হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঋতুবতী নারী তার ই'তেকাফের স্থানে ছালাত ও ছিয়াম ব্যতীত তাসবীহ-তাহলীল ও যিকর-আযকার ইত্যাদি করতে পারে। তবে কষ্ট মনে করলে সে চলেও যেতে পারে। কেননা ই'তেকাফ হজ্জ -এর ন্যায় ফরয ইবাদত নয় বরং নফল ইবাদত মাত্র।

প্রশ্ন (২৯/২০৯)ঃ পরিবার পরিকল্পনার অস্থায়ী পদ্ধতি যেমন মায়াবড়ি, কনডম, নরডেট ২৮, মারভেলন ইত্যাদি কি আযলের অন্তর্ভুক্ত হবে? তুলনামূলক আলোচনা করে জওয়াব দিবেন।

-মুসাম্মাৎ নাদিরা পারভিন
কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মায়াবড়ি, কনডম ইত্যাদি যে কোন অস্থায়ী পদ্ধতি আযলের অন্তর্ভুক্ত হবে। পার্থক্য শুধু এগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী বস্তু মাত্র। আযল করাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যেটা হবার সেটা হবেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৭)*।

প্রশ্ন (৩০/২১০)ঃ এবার তো ঈদ এবং জুম'আ একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিছু লোক জুম'আর ছালাত আদায় করতে গেলেন গোশত করা বাদ দিয়ে। আর কিছু লোক যাননি। ইমাম ছাহেব বললেন, জুম'আতে যেতেই হবে। আমাদের জন্য এই এখতিয়ার নেই। ইমামের কথা কি ঠিক? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-সাইফুদ্দীন
শালবাগান, রাজশাহী।

উত্তরঃ নির্ধারিত ইমাম হ'লে তাকে অবশ্যই জুম'আ পড়ানোর জন্য যেতে হবে। কেননা যারা জুম'আর জন্য উপস্থিত হয়েছে তাদেরকে নিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করতে হবে। যায়েদ বিন আরক্বাম (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদ পড়েছেন ও জুম'আয় রুখছত দিয়েছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে যেন পড়ে' (আহমাদ ও সুনানে আরবা'আহ, ছহীহ ইবনু খুযায়মা প্রভৃতি; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৩৬)। তবে ইমামদের জন্য ঈদ ও জুম'আ দু'টিই পড়া উচিত। কেননা অন্য বর্ণনায় উক্ত হাদীছের শেষে বলা হয়েছে, إِنَّا مُجَمِّعُوْنَ 'আমরা জমা করব' (আবুদাঊদ, ঐ)। কেননা রাসূল (ছাঃ) নিজেই ইমাম ছিলেন। তবে প্রয়োজনবোধে প্রতিনিধি হিসাবে যদি কাউকে ইমামের বদলে পাঠানো হয় তবে সেক্ষেত্রে ইমামের হুকুম সাধারণ মুছল্লীর ন্যায় হবে। তিনি জুম'আ পড়তেও পারেন, ছাড়তেও পারেন।

রেড হার্ট
চাইনিজ ও কমিউনিটি সেন্টার

- বিয়ে সহ যে কোন অনুষ্ঠানের সুব্যবস্থা।
- বর কনে বসার আলাদা (A.C.) কক্ষ।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনফারেন্স রুম।
- চাইনিজ থাই ও দেশী খাবারের সুব্যবস্থা।
- চাহিদা অনুযায়ী প্যাকেট সরবরাহের সুব্যবস্থা।

সাজেদা প্লাজা
লক্ষীপুর, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭১৯৯৮
বাসাঃ৭৭৩৯৮৯

পরিচালনায়
মিসেসঃ মাফরুহা হক বেলা

আল-আরাফা ক্লিনিক
বে-সরকারী হাসপাতাল
(মেডিকেল কলেজ অডিটরিয়ামের পূর্ব পার্শ্বে)

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা সার্জারী, গাইনী, মেডিসিন, হাড়জোড়, নাক-কান-গলা, চর্ম ও যৌনরোগ সমূহের চিকিৎসা ও অপারেশন করা হয়।

ঘোষপাড়া মোড়, রাজশাহী-৬০০০।
ফোনঃ (০৭২১)৭৭১৯২৪